সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.net

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৪৩-৪৪

১৭ আগস্ট ২০২৬, সোমবার

পবিত্র মক্কা নগরীর বহুমাত্রিক নাম

মাক্কাহ • বাক্কাহ • উম্মুল কুরা • আল-আমীন • আল-বালাদ • আল-হারাম

ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, তাওহীদের আদিভূমি এবং বিশ্ব মুসলিমের হৃদস্পন্দন পবিত্র মক্কা নগরী....

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

.٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ

বার্ষিক : ৭০০ টাকা

ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আন্তর্জাতিক

মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-

Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

সূচীপত্র ১

The weekly Arafat

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

৪৩-৪৪ সংখ্যা
১৭ আগস্ট-২০২৬ ঈসায়ী
০২ ভাদ্র-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৩ রবীউল আওয়াল-১৪৪৮ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম

বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

মণির খনি: মহান আল্লাহর ওপর ভরসা ০২

সম্পাদকীয়: ভাইরাল হওয়ার নেশা: খ্যাতির মোহে সত্যের পরাজয় ০৪

দারসুল কুরআন: চারটি পাপ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫

দারসুল হাদীস: ঈমানে পরিপূর্ণ মু'মিন
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৯

প্রধান রচনা– ঈদে মিলাদুন্নবী: বিদআতের ধূম্রজাল ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
রফিকুল ইসলাম- ১২

ইসলামী প্রবন্ধ: দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য
কে. এম আব্দুল জলিল- ১৪

শিক্ষা ও সভ্যতা– ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২০

ক্বাসাসুল হাদীস: হাজার ঋণের বিরল ঘটনা
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৩

আত্মগঠন– ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের জীবনে ইখলাস: একটি বিশ্লেষণ
ড. আহমাদুল্লাহ- ২৪

সাময়িক প্রসঙ্গ: বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি কর্তৃক নিয়োগ না দিতে জোর দাবি ঘনিভূত
মোঃ আঃ সাত্তার ইবনে ইমাম- ২৮

কবিতা ২৯

জমঈয়ত ও শুব্বান সংবাদ ৩০

ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩২

প্রচ্ছদ রচনা: পবিত্র মক্কা নগরীর বহুমাত্রিক নাম
মূল: সলাহ আব্দুস সাত্তার মুহাম্মদ
অনুবাদ ও সংযোজন: তানযীল আহমাদ- ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭, টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.net, www.jamiyat.org.bd, Page:ⓕshaptahikArafat,ⓕgroups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি– মহান আল্লাহর ওপর ভরসা

অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾

অর্থ: "অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয়ের হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ করো; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প করো তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীগণকে ভালোবাসেন।" *(সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৫৯)*

﴿اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾

অর্থ: "যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কেহই তোমাদের ওপর জয়যুক্ত হবে না; এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে থাকে।" *(সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৬০)*

﴿وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

অর্থ: "আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।" *(সূরা আত্-ত্বালা-ক্ব: ৩)*

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

অর্থ: "নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের ওপর নির্ভর করে।" *(সূরা আল-আনফাল: ২)*

﴿وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ﴾

অর্থ: "আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করব না কেন? তিনিইতো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ, আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা উচিত।" *(সূরা ইব্রা-হীম: ১২)*

﴿قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾

অর্থ: "বলো: আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোনো বিপদ আমাদের ওপর আপতিত হবে না, তিনিই আমাদের কর্ম বিধায়ক, আর সকল মু'মিনের কর্তব্য হলো, তারা যেন নিজেদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে।" *(সূরা আত্-তাওবাহ্: ৫১)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

❁ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُوْ خِمَاصًا، وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

❁ **অর্থ:** ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “তোমরা যদি মহান আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিয্‌ক দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদের রিয্‌ক দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় পরিতৃপ্ত (ভরা পেট) অবস্থায় ফিরে আসে।” *(সুনান আত-তিরমিযী- হা. ২৩৪৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৬৪)*

❁ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

❁ **অর্থ:** ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন: “হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি– তুমি মহান আল্লাহর (দ্বীন ও বিধান) সংরক্ষণ করো, আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সংরক্ষণ করবেন। তুমি মহান আল্লাহকে সংরক্ষণ করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন তুমি কিছু চাইবে, মহান আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে, মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। আর জেনে রাখো– সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবুও তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তা‘আলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন ততটুকু ছাড়া। আর তারা যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তবুও তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তা‘আলা তোমার বিরুদ্ধে লিখে রেখেছেন ততটুকু ছাড়া। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফাসমূহ শুকিয়ে গেছে।” *(সুনান আত-তিরমিযী- হা. ২৫১৬; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৬৬৯)*

❁ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

❁ **অর্থ:** আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “শক্তিশালী মু’মিন মহান আল্লাহর কাছে দুর্বল মু’মিনের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়; তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার জন্য উপকারী, তার প্রতি আগ্রহী হও; মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং অক্ষম হয়ে বসে থেকো না। আর যদি তোমার কোনো বিপদ বা অপছন্দনীয় ঘটনা ঘটে, তখন বলো না– ‘আমি যদি এমনটি করতাম, তাহলে এমন এমন হতো;’ বরং বলো– ‘এটি মহান আল্লাহর তাকদীর; তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।’ কারণ ‘যদি’ বলা শয়তানের কাজের দরজা খুলে দেয়।” *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৬৪)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

ভাইরাল হওয়ার নেশা: খ্যাতির মোহে সত্যের পরাজয়

এই তো ক'দিন আগেও মানুষ ভালো কাজ করত মানবতার কল্যাণে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির নিমিত্তে এবং সমাজের জন্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়ার তীব্র তামান্নায়। কাজটি কত মানুষ দেখল, কতজন প্রশংসা করলো- তা মুখ্য ছিল না; মুখ্য ছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কিংবা মানুষের কল্যাণ। কিন্তু ডিজিটাল যুগে আমাদের মানসিকতার সেই জায়গায় যেন নতুন একটি প্রশ্ন এসে উঁকি দিচ্ছে- "এটা ভাইরাল হবে তো?"

একটি বক্তব্য কতটা সত্য, একটি লেখা কতটা উপকারী কিংবা একটি কাজ কতটা কল্যাণকর- তার চেয়ে অনেকের কাছেই এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কতটা ভিউ হলো, কয়টি লাইক পড়ল, কতজনে শেয়ার করলো। এ যেন সত্যের চেয়ে ট্রেন্ড, প্রজ্ঞার চেয়ে চাঞ্চল্য আর ইখলাসের চেয়ে আত্মপ্রচারের মূল্য ক্রমেই বাড়ছে।

প্রযুক্তি নিজে কোনো সমস্যা নয়; বরং এটি আল্লাহ তা'আলার এক মহা নিয়ামত। এর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত, জ্ঞানচর্চা, জনসচেতনতা ও মানবকল্যাণের বার্তা মুহূর্তেই অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। বিপত্তি তখনই, যখন নিয়্যাতের মধ্যে ইবলিসের অনুপ্রবেশ ঘটে। ভাইরাল হওয়ার নেশা যখন অন্তরের ইখলাসকে গ্রাস করে, তখন মানুষ সত্য বলার আগে ভাবে, কীভাবে বললে, বেশি মানুষ দেখবে! ভাইরাল হওয়া যাবে!

এই প্রবণতা আজ ওয়াজ মাহফিলের মঞ্চ থেকেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনো বক্তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ক'জনের হৃদয় পরিবর্তন করলো, কতজন মানুষ আল্লাহমুখী হলো– তার চেয়ে কখনো কখনো বেশি আলোচিত হয় তাঁর কোন বাক্যটি ভাইরাল হলো, কাকে কতটা কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হলো কিংবা কোন বক্তব্যে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। অথচ একজন দাঈ'র কাজ মানুষকে নিজের দিকে ডাকা নয়; মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। সূরা ইউসুফে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আমি এবং আমার অনুসারীরা জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি।"

ভাইরাল সংস্কৃতির আরেকটি ভয়ঙ্কর দিক হলো– যাচাই-বাছাইয়ের আগে প্রচার, অনুসন্ধানের আগে সিদ্ধান্ত এবং প্রমাণের আগেই রায়। একটি ভিডিও ছাড়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য; কোনো অভিযোগ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিচার; একটি খবর এলো, যাচাই না করেই শেয়ার। অথচ সূরা আল-হুজুরা-ত-এ কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে-

"কোনো সংবাদ এলে তা যাচাই করে নিতে।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সতর্ক করেছেন, "মানুষ যা শোনে তাই বলে বেড়ানোই তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

মতভেদও আজ অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে জনপ্রিয়তার হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। ব্যক্তি আক্রমণ, বিদ্রূপ, কটূক্তি ও পাল্টাপাল্টি বক্তব্য সাময়িকভাবে দর্শক বাড়াতে পারে; কিন্তু এতে সমাজের শান্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও উম্মাহর ঐক্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সত্য প্রতিষ্ঠার নামে ন্যায়বিচার বিসর্জন দেওয়া কখনোই সত্যের সেবা হতে পারে না।

তবে ভাইরাল হওয়া কোনো অপরাধ নয়। একটি কল্যাণকর কথা ভাইরাল হোক, কোনো অসহায় মানুষের সাহায্যের আবেদন ছড়িয়ে পড়ুক, দ্বীনের একটি সহীহ শিক্ষা লাখো মানুষের কাছে পৌঁছে যাক- এতে আপত্তির কিছু নেই। সমস্যা তখনই, যখন ভাইরাল হওয়াই লক্ষ্য হয়ে যায়।

আজ তাই আমাদের আত্মসমালোচনার সময়। আমি কি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কথা বলছি, নাকি মানুষের করতালির জন্য? আমি কি সত্য প্রতিষ্ঠা করছি, নাকি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছি? আমার কথা কি মানুষের উপকার করছে, নাকি অপ্রয়োজনীয় বিভেদ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করছে?

লাইক, শেয়ার, ফলোয়ার কিংবা ভিউ- এসব আখিরাতের কোনো মাপকাঠি নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"

অতএব, আমাদের লক্ষ্য হোক- ভাইরাল হওয়া নয়, সত্যনিষ্ঠ হওয়া; আত্মপ্রচার নয়, আত্মশুদ্ধি; মানুষের প্রশংসা নয়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। কারণ জনপ্রিয়তার আলো একদিন নিভে যাবে; কিন্তু ইখলাসের সঙ্গে করা একটি সত্যনিষ্ঠ কাজ মানুষের কল্যাণে এবং মহান আল্লাহর কাছে কখনোই বৃথা যায় না।

درس القرآن / দারসুল কুরআন:

চারটি পাপ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ حَتّٰٓى أَتٰىنَا الْيَقِيْنُ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"(সেদিন জাহান্নামীদেরকে বলা হবে-) কিসে তোমাদেরকে সাক্বার (অর্থাৎ- জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? (উত্তরে) তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দান করতাম না। আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে (সত্য পথের পথিকদের) সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম। আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। অবশেষে (এ অবস্থায়) আমাদের কাছে মৃত্যু চলে আসে।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

مَا -(এটি একটি প্রশ্নবোধক শব্দ) অর্থ- কিসে?, سَلَكَكُمْ -তোমাদেরকে এখানে এনেছে, فِيْ -(কোন স্থান/কোন সময়ের) মধ্যে, سَقَرَ -এটি জাহান্নামের একটি স্তর/নাম, قَالُوْا -তারা বললো, لَمْ نَكُ -আমরা ছিলাম না, مِنَ الْمُصَلِّيْنَ -মুসল্লীদের/সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত, وَ -এবং, لَمْ نَكُ نُطْعِمُ -আমরা খাওয়াই নাই, الْمِسْكِيْنَ -অভাবগ্রস্ত, হৃতসর্বস্ব, (পরিভাষায়-মিসকিন হলো এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার নিজের ব্যয় নির্বাহ করার মতো কিছুই নেই। সহায় সম্পদ বলতে কিছুই নেই), وَ -এবং, كُنَّا -আমরা ছিলাম, نَخُوْضُ -আমরা সমালোচনা করতাম, مَعَ -সাথে থেকে, الْخَآئِضِيْنَ -যারা সমালোচনাকারী, وَ كُنَّا نُكَذِّبُ -এবং আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, بِيَوْمِ الدِّيْنِ -প্রতিদান দিবসকে, حَتّٰٓى -এ সময় পর্যন্ত, أَتٰىنَا -আমাদের কাছে এসেছে, الْيَقِيْنُ -নিশ্চয়তা (এখানে এর অর্থ হবে- নিশ্চিত মৃত্যু)।

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে উল্লেখিত আয়াত ছয়টি কুরআনুল কারীমের ৭৪ নং সূরা- সূরা আল-মুদ্দাস্সির থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো সূরা আল-মুদ্দাস্সির-এর ৪২ থেকে ৪৭ নম্বর আয়াত।

শানে নুযুল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট

এ আয়াতগুলোর শানে নুযুল আ অবতরণের বিশেষ কোনো কারণ নেই, তবে এগুলো মক্কী যুগে নাযিল হওয়া সূরা আল-মুদ্দাস্সির-এর অংশ। সূরা আল-মুদ্দাস্সির ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সাধারণত এ আয়াতগুলোতে জাহান্নামীরা কেন জাহান্নামে শাস্তির সম্মুখীন তার বর্ণনা দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে এ অপরাধসমূহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে জাহান্নামীদের চারটি অপরাধের বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। **এক-** সালাত পরিত্যাগ, **দুই-** অভাবগ্রস্তদের খাদ্য না দেয়া, **তিন-** সমালোচকদের সাথে মিশে পূণ্যবানদের সমালোচনা করা ও **চার-** প্রতিফলদিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

জান্নাতীদের সংলাপ ও অপরাধীদের জবানবন্দী: পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতের দিকে তাকালেই দেখা যায় সেখানে জান্নাতীদের পারস্পারিক একটি সংলাপের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ﴾

অর্থ- "জান্নাতে (জান্নাতীগণ) একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে।"

** এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*
১ সূরা আল-মুদ্দাস্সির: ৪২-৪৭।

তাদের সেই পারস্পারিক জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়বস্তু কি হবে? তাও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পরের আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ﴾

অর্থ- "তারা পরস্পপর জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের সম্পর্কে" এবং তারা জানতে চাইবে কোন অপরাধে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ﴾

অর্থ- "(তারা জিজ্ঞাসা করবে) কিসে তোমাদেরকে সাক্বার (অর্থাৎ- জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে?"

অপরাধীরা তখন তাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে তাদের বড় বড় চারটি অপরাধের কথা বলবে। তাদের সেই চারটি অপরাধ বিস্তারিতভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

এক- সালাত পরিত্যাগ: এটাই হলো তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। তাই সে সময়ে তারা এই অপরাধের কথাই প্রথমে উল্লেখ করবে। তারা বলবে–

﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ﴾

অর্থ- "আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।"

ইমাম কুরতুবী এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে– যেসব মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সালাত ঠিকমত আদায় করছে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।[২] সালাত হলো মহান আল্লাহর অধিকার। এই সালাত পরিত্যাগ করা একটি কবিরা গুনাহ। এ গুনাহ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, তাওবায়ে খুলুসা ছাড়া তা থেকে বাঁচার উপায় নেই। সালাত পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে নবী (ﷺ) কঠোর হুশিয়ারী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

অর্থ- মানুষ (মুসলিম ও মু'মিন) এবং শিরক-কুফ্রীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ করা।[৩]

তিনি আরো বলেন–

«اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

অর্থ- আমাদের (মুসলমানদের) ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিলো সে কুফ্রী করলো।[৪]

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম সালাত ব্যতীত আর কোনো 'আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফ্রী মনে করতেন না। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিলো ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।

উল্লেখিত ও অন্যান্য দলিলসমূহ সালাত পরিত্যাগকারী বড় কুফ্রীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ; যদিও সে (সালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি) সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে না। আর এ মত পোষণ করেন ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেন।

"أَوَّلُ مَا تَفْقِدُوْنَ مِنْ دِيْنِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُوْنَ منه الصَّلَاةُ".

অর্থ- সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তাহলো সলাত (নামায)।[৫]

সাউদি আরবের গ্রাণ্ড মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ বিন বায ও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-সহ বর্তমান যুগে অনেক ওলামায়ে কেরাম সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুফ্রীর ফাতাওয়া দিয়েছেন। সুতরাং কোনো অবস্থাতে কোনোভাবেই এ সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না।

দুই- অভাবগ্রস্তদের খাদ্য না দেয়া: তারপর তারা তাদের আরো একটি অপরাধ উল্লেখ করে বলবে,

﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ﴾

অর্থ- "আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দান করতাম না।"

---

[২] *তাফসীরে কুরতুবী।*

[৩] *সহীহ মুসলিম- (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), হা. ১৫০, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা. ১৩৪/৮২।*

[৪] *জামে আত্ তিরমিযী- (ই. ফা.), হা. ২৬২২, মা. শা., হা. ২৬২১, সহীহ।*

[৫] *ইমাম বাইহাক্বী হাদীসটিকে তার শু'আবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন। শু'আবুল ঈমান- বায়হাক্বী, ৪/৩২৫, হা. ৪৮৯১।*

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ও তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়েছে– অভাবী মানুষকে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও খাবার না দেয়া বা সাহায্য না করা মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ। আর যে ব্যাক্তি শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবীকে খাদ্য খাওয়াবে তার এ 'আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূল (ﷺ) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে গেলেন। মদিনায় গিয়ে তিনি জাতীর উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম যে উপদেশ দিলেন তাতে বললেন–

"أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوْا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ".

অর্থ- হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রচলন করো, খাদ্য খাওয়াও (ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায়: এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো) এবং যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন (রাতের গভীরে তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করো, তাহলেই তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬]

আলোচ্য হাদীসে খাবার খাওয়ানোর হুকুমটি ব্যাপক। খাবার খাওয়ানো দ্বারা যে কেবল ক্ষুধা নিবারণ হয় তাই নয়; বরং এটা পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসারও নিদর্শন। তাই এটা সকলের জন্যই অবারিত থাকা উচিত। ইসলামে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাবার খাওয়ানোর দ্বারা যেহেতু পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাই খাওয়ানোর ভেতর শুধু অভাবীদেরকেই নয়; বরং সকলকেই শরীক রাখা উচিত। অন্নদান করা ব্যক্তির উদারতা ও বদান্যতারও পরিচায়ক। এটি একটি মহৎ গুণ। এগুণ ইসলামের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক শিক্ষা। তাই অন্নদানকে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যখন যাকে পাওয়া যায় তাকেই নিজ খাবারে শরীক রাখা উচিত। তাছাড়া অন্নদান করাটা সহমর্মিতারও প্রকাশ। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করাও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক শিক্ষা। তাই ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত, সে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি যেই হোক না কেন। সে যদি অনাত্মীয়ও হয়, এমনকি অমুসলিমও যদি হয়, তবুও তার ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করা ঈমানের দাবি। শুধু মানুষকেই নয়; বরং পশু-পাখির ক্ষুধা নিবারণ করাও অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। কাকে কাকে খাওয়ানো হবে তা যেমন ব্যাপক, তেমনি কী খাওয়ানো হবে তাও ব্যাপক ও সাধারণভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ- এটা নির্ভর করে যে খাওয়াবে তার সামর্থ্যের ওপর। সে যা পারবে তাই খাওয়াবে। খাওয়ানোর সাওয়াব পাওয়ার জন্য দামি খাবার খাওয়ানো বা মুখরোচক খাবার খাওয়ানোর শর্ত নেই। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যা খাওয়ানো হবে তাতেই সাওয়াব পাওয়া যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। খাবারের চেয়ে ব্যক্তির সদিচ্ছা ও আন্তরিকতাই বড়। আন্তরিকতাসহ সামান্য কিছুও যদি হাদিয়া হিসেবে দেয় পরম আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করা উচিত। নবী (ﷺ) বলেছেন,

«يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».

অর্থ- হে মুসলিম নারীগণ! কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর জন্য তুচ্ছ মনে না করে, তা বকরির একটা পায়া হলেও।[৭]

সুতরাং সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষকে খাওয়াতে হবে। আর কারো হাদীয়া-তুহফা আগ্রহভরে গ্রহণ করতে হবে। যদি তা সামান্য কিছুও হয়।

তিন- সমালোচকদের সাথে মিশে পুণ্যবানদের সমালোচনা করা: এখানে তারা তাদের তৃতীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবে–

﴿وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম।"

অসার তর্ক-বিতর্কে এবং ভ্রষ্টতার সমর্থনে তাদের কথাবার্তায় বড়ই উদ্যমের সাথে আমরা অংশ নিতাম। এটা যে কত বড় পাপ, তারা তখন তা উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু এই সময়ে উপলব্ধি করে তো কোনো লাভ হবে না। উপলব্ধি করার প্রয়োজন ছিল পার্থিব জীবনে। যখন তার 'আমল লিপিবদ্ধ হতো এবং যখন সে চাইলে তাওবাহ্ করতে পারতো। তখন তো সে তা করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে সুযোগ

[৬] *ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার- অধ্যায়: ৪২, হা. ২৬৩৩; শু'আবুল ঈমান- হা. ৩০৯০; আদ্ দারিমী- ১৫০১, ২৬৭৪।*

[৭] *সহীহ বুখারী- হা. ২৫৬৬।*

দিয়েছেন। তারা ফিরে না আসায় তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾

অর্থ- "অতএব যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও!"[৮]

অর্থাৎ- বাজে ও অনর্থক আলোচনায় মগ্ন থাকতে এবং নিজেদের দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকতে দাও। আর এদিকে তুমি তোমার প্রচার-প্রসারের কাজ অব্যাহত রাখো। তাদের আচরণ যেন তোমাকে তোমার দায়িত্ব পালনে উদাসীন অথবা মনঃক্ষুণ্ণ না করে। সুতরাং আজ চূড়ান্ত ফয়সালার দিন তারা তাদের জন্য জাহান্নামের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে থাকুক।

চার- প্রতিফলদিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা: এটা এমন একটা অপরাধ যা সরাসরি কুফ্‌রী। যে ব্যক্তি পরকালকে অস্বীকার করে সে নিশ্চত কাফির। তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

অর্থ- "তারা বলে আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন, অতএব, স্বীয় কুফ্‌রীর কারণে শাস্তি আস্বাদন করো।"[৯]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾

অর্থ- "সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, এটা পুরাতনকালের রূপকথা। কখনো না; বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো না তারা সেদিন তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।"[১০]

শিক্ষাসমূহ

এক- প্রতিটা মানুষের কর্মফল প্রদানের জন্যই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সদাসর্বদা পূণ্যের কাজ করে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর এমন কাজ কিছুতেই করা যাবে না। যে কাজ মানুষকে জাহান্নামের শাস্তির মুখোমুখি করে।

দুই- জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই ভালো সালাত আদায়কারী হতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য পরকালে দুর্ভোগ রয়েছে।

তিন- জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য একটি সহজ ও ভালো 'আমল হলো মানুষকে খাওয়ানো।

চার- কারো গীবত, সমালোচনা ও পরনিন্দা মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা একটি বড় পাপ যা মানুষকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে।

পাঁচ- দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয়, মৃত্যুপরবর্তী আরো একটি জীবন রয়েছে। পার্থিব জীবন হলো ক্ষণস্থায়ী পক্ষান্তরে মৃত্যুপরবর্তী জীবন হলো চিরস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াই প্রত্যেকে মানুষের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

---

[৮] *সূরা আল-মা'আরিজ: ৪২।*
[৯] *সূরা আল-আন'আম: ২৯-৩০।*
[১০] *সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন: ১০-১৭।*

দারসুল হাদীস/ درس الحديث:

ঈমানে পরিপূর্ণ মু'মিন

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

সরল বাংলা অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঐ মু'মিন ঈমানে পরিপূর্ণ যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।[১১]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আমাদের জীবনে চরিত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমরা সাধারণত কোনো মানুষকে ভালো-মন্দের বিচার করে থাকি তার চরিত্রের মানদণ্ডে। এজন্যই ইসলাম উত্তম চরিত্রের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছে একদা নবী (ﷺ) বললেন,

تَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْأَجْوَفَانِ: الْفَرْجُ وَالْفَمُ، وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

তোমরা কি জানো, কোন জিনিসটি অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে?' সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, 'দু'টি ছিদ্র (১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। আর (তোমরা কি জানো) কোন জিনিসটি অধিক পরিমাণে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? (সেগুলো হলো) আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র'।[১২]

জীবনে চলার পথে আমাদের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে স্বভাব ফুটে উঠে, তারই নাম চরিত্র'। অন্যভাবে বলা যায়– মানবজীবনের সকল আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টিই হচ্ছে চরিত্র। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

اَلدِّيْنُ كُلُّهُ خُلُقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّيْنِ.

চরিত্রই হচ্ছে দ্বীন। চরিত্রের দিক দিয়ে যিনি তোমার চেয়ে বেশি অগ্রসর, দ্বীনের দিক দিয়েও তিনি তোমার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।[১৩]

আল্লামা জুরজানী আখলাকে হাসানার একটি যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তৎপ্রণীত 'কিতাবুত তা'রীফাত' নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন– খুলুক বা চরিত্র হচ্ছে আত্মার বদ্ধমূল এমন একটি অবস্থা, যা থেকে কোনো চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই অনায়াসে যাবতীয় কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। আত্মার ঐ অবস্থা থেকে যদি বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়তের আলোকে প্রশংসনীয় কার্যকলাপ প্রকাশ হয় তবে তাকে আখলাকে হাসানা নামে অভিহিত করা হয়।[১৪]

অর্থাৎ- কোনো মানুষের নিকট থেকে যদি স্বভাবগতভাবে প্রশংসনীয় আচার-আচরণ প্রকাশ পায় তবে তাকে আখলাকে হাসানা বলা হয়। Oxford dictionary-তে বলা হয়েছে– Character is the particular combination of qualities in a person that makes him different from other. It is such a quality which leads a man to be determined and able to bear dificulties.

'চরিত্র হচ্ছে কোনো মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো স্বতন্ত্র গুণাবলীর সমাবেশ, যা মানুষকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। এগুলো এমন কিছু গুণ, যা মানুষকে সংকল্পবদ্ধ হতে ও কঠিন কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে। হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সচ্চরিত্র হলো হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, দানশীলতা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া'।[১৫] রাসূল (ﷺ) উত্তম আখলাক সম্পর্কে দু'আ করতেন, তিনি নিজে গুনাহমুক্ত হয়েও নিজের চরিত্র সুন্দর করার তাওফীক্ব অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন। যেমন- তিনি দু'আয় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

হে আল্লাহ! তুমি আমার গঠন-আকৃতি সুন্দর করেছ, আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।[১৬]

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।*

[১১] *সুনানে আবূ দাঊদ- হা. ৪৬৮২।*

[১২] *আদাবুল মুফরাদ- হা. ২৮৯।*

[১৩] *মাদারিজুস সালিকীন- ২/২৯৪।*

[১৪] *কিতাবুত তা'রীফাত- শরীফ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, পৃ. ১০১।*

[১৫] *মিনহাজুল মুসলিম- আবূ বকর আল জাযাইরী, পৃ. ১১৫।*

[১৬] *ইবনু হিব্বান- ৯৫৫; আবী ইয়ালা- ১/২৪৩; আত্ তায়ালিসী- ১/২৫৬; আহমাদ- ১/২০৩; মাজমাউয যাওয়াইদ- ১০/১৭৩।*

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ)-এর উত্তম চরিত্রের প্রশংসাও করেছেন, তিনি বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"আপনি তো মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[১৭]

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ)-এর আখলাকের প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রচুর আয়াতে আখলাকের বিবরণ ও চরিত্রবানদের প্রশংসার বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, মাক্কী ও মাদানী উভয় সূরাগুলোতে আখলাকের নির্দেশ বেশি থাকায় এর গুরুত্বেরও আধিক্য বুঝা যায়, যা থেকে কোনো মুসলিমের দূরে থাকা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবূ সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।[১৮] রাসূল (ﷺ) বলেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ.

আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য।[১৯]

তাই দেখা যায়, নবুওয়াত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুওয়াত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। জুন্দুব ইবনু জুনাদাহ ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

মহান আল্লাহকে ভয় করবে তুমি যখন যেভাবেই থাকো না কেন। আর মন্দ কাজ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নেক কাজ করবে। কেননা নেক কাজ মন্দকে মুছে ফেলে। আর মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।[২০]

উত্তম চরিত্রের মর্যাদা ও প্রাপ্তি: উত্তম আখলাক যেহেতু ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, সেজন্য এর ফযীলাত সওয়াব ও মর্যাদাও অপরিসীম। এ ব্যাপারে বিপুল আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে খুব সংক্ষেপে উত্তম আখলাকের মর্যাদার কয়েকটি দিক তুলে ধরছি।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা অর্জন: উত্তম আখলাক-এর অন্যতম একটি মর্যাদা হচ্ছে, এর মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। অর্জন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ ؟ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

মহান আল্লাহর নিকট তার বান্দাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচে প্রিয়– যার আখলাক স্বভাব চরিত্র সবচে সুন্দর।[২১]

মহানবী (ﷺ)-এর নৈকট্য লাভ করা যায়: হাদীসে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا".

জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে তোমাদের মধ্যে আমার বেশি প্রিয় এবং আমার মজলিসের বেশি নিকটবর্তী তারাই থাকবে যারা তোমাদের ভেতর সর্বোত্তম চরিত্রবান।[২২]

বলার অপেক্ষা রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা অর্জন করা এবং কিয়ামতের দিন নবী (ﷺ)-এর সবচেয়ে কাছে থাকতে পারা একজন মু'মিনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। যার কোনো তুলনা হয় না।

ঈমানের পূর্ণতার নিদর্শন: দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, উত্তম আখলাক হলো একজন মু'মিনের ঈমানি পূর্ণতার একটি বিশেষ নিদর্শন। হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে,

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا».

মু'মিনদের মধ্যে যার আখলাক সবচে সুন্দর, সেই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।[২৩]

মিজানের পাল্লায় সবচে ভারি বস্তু উত্তম আখলাক: আমরা এই পৃথিবীতে ভালো-মন্দ যা কিছু করছি, কিয়ামতের দিন এসব কিছু দাড়ি পাল্লায় ওজন করা হবে। সেই ওজনে যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সেই হবে সম্মানিত, জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতের উত্তম জীবন লাভ করবে। এখন জানার বিষয় হলো, সেই দাড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস কী হবে? এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে–

---

[১৭] *সূরা আল-কলম: ৪।*
[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭।*
[১৯] *হাকেম- হা. ৪২২১; সহীহাহ্- হা. ৪৫।*
[২০] *সুনানে তিরমিযী- হা. ১৯৮৭।*
[২১] *মুস্তাদরাকে হাকিম- হা. ৮২১৪।*
[২২] *সুনানে তিরমিযী- হা. ২০১৮।*
[২৩] *সুনানে আবূ দাঊদ- হা. ৪৬৮২।*

عن أمامة الباهلي (ﷺ) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَ إِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَ بِبَيْتٍ فِيْ وَسْطِ الْجَنَّةِ، لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ، وَ إِنْ كَانَ مَازِحًا، وَ بِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ، لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ.

আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ঘর নিয়ে দেয়ার জন্য যামীন, যে কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করে। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দেয়ার জন্য যামীন, যে মিথ্যা পরিহার করে এমনকি হাঁসি ঠাট্টার ছলেও এবং আরো একটি ঘর জান্নাতের সর্বোচ্চে নিয়ে দেয়ার জন্য যিম্মাদার, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে।[২৯]

অসচ্চরিত্রের পরিণাম: ইসলামে উত্তম চরিত্রের প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন ফযীলাতের ঘোষণা দিয়ে আখলাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্র অর্জনে উৎসাহিত করেছে। আবার ইসলাম বিভিন্ন মন্দ পরিণতি ও শাস্তির কথা উল্লেখ করে অপছন্দনীয় ও নিন্দিত স্বভাব বর্জনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কারণ, ব্যক্তির মন্দ স্বভাব তার জান্নাত হারানোর অন্যতম কারণ।

عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ: وَالْجَوَّاظُ: الْغَلِيْظُ الْفَظُّ.

হারিসা ইবনু ওয়াহব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: জাওয়ায ও জাযারি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায অর্থ অসভ্য।[৩০] মন্দ স্বভাবের লোকের জন্য তো এই একটি হাদীসই যথেষ্ট যে, তার লালিত মন্দ স্বভাব জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম বাধা হবে।

উপসংহার

সচ্চরিত্র ছাড়া ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তির আশা করা যায় না। একমাত্র সৎ স্বভাব দ্বারাই সমাজে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব। কেননা, চরিত্রহীন লোক অন্যায়, ব্যভিচার, অত্যাচার, সংঘাত, কলহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। পক্ষান্তরে, সচ্চরিত্রবান লোক নিজ চরিত্রগুণে সমাজ-চরিত্রকেও সংশোধনের চেষ্টা করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। সৎ চরিত্র ও উত্তম আদর্শ ব্যক্তির জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

[২৯] *সুনানে আবূ দাঊদ- হা. ৪৮০০; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব- বায়হাক্বী, হা. ৪১৭৯।*
[৩০] *সুনানে আবূ দাঊদ- হা. ৪৮০১।*

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ "مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ.

আবূদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কিয়ামত দিবসে মু'মিনের দাড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে বেশি ওজনের আর কোনো জিনিস হবে না। কেননা, আল্লাহ অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।[২৪]

ঘর বাড়ি আবাদ হয়, হায়াতে বৃদ্ধি ঘটে: 'আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মুসনাদে আহমাদে উত্তম আখলাকের আরেকটি মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন,

حُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيْدَانِ فِيْ الْأَعْمَارِ.

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং উত্তম আখলাক ধারণ করা– এগুলো ঘরবাড়িকে আবাদ রাখে এবং মানুষের হায়াতে বৃদ্ধি ঘটায়।[২৫]

নফল সালাত ও সিয়াম রাখার মর্যাদা: উত্তম আখলাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফযীলাত হচ্ছে– এর মাধ্যমে একজন মু'মিন নফল সালাত ও সিয়াম রাখার মর্যাদা লাভ করতে পারে। সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتٍ، قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ.

একজন মু'মিন তার উত্তম আখলাক চরিত্র দ্বারা রাতে সালাত আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মর্যাদা অর্জন করে।[২৬]

জান্নাতের সুউচ্চ আসন লাভ: এ সকল কারণে যে কয়েকটি বিষয় মানুষকে সবচেয়ে বেশি হারে জান্নাতে নিয়ে যাবে, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী উত্তম আখলাকও তার মধ্যে অন্যতম। একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ.

কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় সচ্চরিত্র সবচে বেশি ওজনী ও ভারী হবে।[২৭] আরেক হাদীসে এসেছে–

أَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ: تَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

আল্লাহভীতি ও নেক চরিত্র এমন এক গুণ, যার উসিলায় অধিক হারে মানুষ জান্নাতে যাবে।[২৮]

[২৪] *সুনানে তিরমিযী- হা. ২০০২।*
[২৫] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৫২৫৯।*
[২৬] *আবূ দাউদ- হা. ৪৭৯৮; হাকীম- মা. শা., হা. ১৯৯।*
[২৭] *সুনানে তিরমিযী- হা. ২০০২।*
[২৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৯০৯৬।*

مقالةرئيسة / প্রধান রচনা

ঈদে মিলাদুন্নবী: বিদআতের ধূম্রজাল ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

রফিকুল ইসলাম*

ভূমিকা: মানবজাতির হেদায়েত ও চূড়ান্ত নাজাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এক অমলিন ও শাশ্বত আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানের মূল ভিত্তি। তবে ইসলামের সুসংহত ইতিহাসে এই ভালোবাসা প্রকাশের পথ ও পদ্ধতিকে সর্বদাই সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খল ও শরিয়তের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

কালের পরিক্রমায় ও আবেগের আতিশয্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহর অনুকরণের চেয়ে বাহ্যিক নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতা ও আচার-অনুষ্ঠান প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বিশেষ করে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উদযাপনের ঐতিহাসিক উদ্ভব, এর সামাজিক বিস্তার এবং দ্বীনের মৌলিক কাঠামোর বাইরে তৈরি হওয়া নানাবিধ নব্য প্রথা বা 'বিদআত'-এর ধূম্রজাল আধুনিক মুসলিম উম্মাহর সামনে এক বড় ধর্মীয় ও 'আক্বিদাহ্‌গত জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরিয়তের বিশুদ্ধ উৎস, ইতিহাস এবং সালাফ ও বিজ্ঞ ইমামগণের মতামতের আলোকে এই বিষয়ে সঠিক ও নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা অত্যন্ত জরুরি।

হিদায়াতের অমোঘ আলোকবর্তিকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা প্রতিটি মু'মিনের ঈমানী সত্তার অবিচ্ছেদ্য মৌলিক ভিত্তি। তবে ইসলামের মৌলিক 'আক্বিদাহ্‌ ও শরিয়তের ইতিহাসে ভালোবাসা প্রকাশের পদ্ধতিটি সর্বদাই সুনির্দিষ্ট সুন্নাহর চৌকাঠে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যুগে যুগে শরিয়তের সুনির্দিষ্ট চেতনার বিপরীতে আবেগের আতিশয্য বা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার প্রলেপ যুক্ত হয়ে দ্বীনের নান্দনিক সৌন্দর্যকে কীভাবে আচ্ছন্ন করেছে– 'মিলাদুন্নবী' উদযাপন ও তার ঐতিহাসিক পরিক্রমা তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঐতিহাসিক সূচনা ও বিবর্তনের পথরেখা: ইসলামী শরিয়ত ও ইতিহাসের প্রাথমিক তিন স্বর্ণযুগ –যাকে হাদীসের পরিভাষায় 'খাইরুল কুরুন' (সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের জামানা) বলা হয়– সেই যুগে ১২ রবিউল আউয়ালকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উৎসব হিসেবে বাৎসরিক মিলাদ মাহফিল বা আনন্দ-মিছিলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে, তাঁর চার খলিফা কিংবা যুগের সুপ্রসিদ্ধ কোনো মুজতাহিদ ইমাম এই ধরনের কোনো বাৎসরিক উৎসব পালন করেননি কিংবা এর নির্দেশও প্রদান করেননি।

ইতিহাসবিদ ও সিরাত বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী, হিজরি চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মিশর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে শিয়া ফাতেমীয় রাজবংশের শাসনামলে সর্বপ্রথম এই ধরনের বার্ষিক উৎসবের রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক প্রবর্তন ঘটে। পরবর্তীতে হিজরি ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে ও সপ্তম শতকের প্রারম্ভে ইরাকের ইরবিল অঞ্চলের সুফিপ্রবণ শাসক সুলতান মুজাফফরউদ্দীন কুকবুরী একে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উৎসবে রূপ দান করেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সুফি চিন্তাধারার প্রসার এবং জনমনে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়েই ইসলামের মৌলিক 'ইবাদতের তালিকায় এটি ধীরে ধীরে স্থান করে নেয়।[৩১]

শারঈ নিরিখ ও 'বিদআত' শাস্ত্রের অমোঘ নীতি: ইসলামী ফিকহ ও শরিয়তের শাস্ত্রীয় মূলনীতিতে যেকোনো 'ইবাদত বা দ্বীনি 'আমলের গ্রহণযোগ্যতার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো– তা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবীদের 'আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত হতে হবে। শরিয়তের নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে দ্বীন বা সাওয়াবের নিয়তে কোনো নতুন নিয়ম

*শিক্ষার্থী, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

[৩১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনু কাসীর (*), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬-১৩৭।*

বা প্রথা উদ্ভাবন করাকেই শারঈ ভাষায় 'বিদআত' বলা হয়।

দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো আনুষ্ঠানিকতা সংযোজনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"[৩২]

সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিসংকট সৃষ্টি: ঐতিহাসিক ও 'আক্বিদাহ্গত পর্যালোচনার পাশাপাশি মিলাদুন্নবী কেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিকতার আরেকটি সামাজিক নেতিবাচক দিক হলো সমাজে কৃত্রিম শ্রেণিভেদ ও মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য সৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বড় বড় বাজেট ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে একটি পক্ষ নিজেদের 'একচ্ছত্র নবীপ্রেমিক' হিসেবে জাহির করেন, অন্যদিকে সাধারণ বা সুন্নাহ অনুসরণকারী মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা চালানো হয়। দ্বীনের একটি নফল বা অনির্ধারিত আচারকে কেন্দ্র করে উম্মাহর মধ্যে এই কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ ছড়ানো ইসলামের সামাজিক সংহতির মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৩৩]

ইসলাম কোনো অসম্পূর্ণ জীবনবিধান নয় যে, যুগে যুগে এতে নতুন কোনো উৎসব বা 'ইবাদতের সংযোজন ঘটাতে হবে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করে বলেছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম।"[৩৪] ইমাম আবূ ইসহাক আশ-শাতিবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ই'তিসাম'-এ উল্লেখ করেছেন যে, দ্বীনের মধ্যে যেকোনো নতুন সংযোজন প্রকারান্তরে দ্বীনের অসম্পূর্ণতার দাবিদার, যা সালাফদের 'আক্বিদাহ্র পরিপন্থী।[৩৫]

আধুনিক যুগে বাড়াবাড়ি ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ: বর্তমান যুগে মিলাদুন্নবী উদযাপনের নামে যে সামাজিক আড়ম্বর গড়ে উঠেছে, তা কেবল বিদআতের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা নানারূপ 'আক্বিদাহ্গত সীমানা লঙ্ঘন ও অপসংস্কৃতির ধুম্রজালে রূপ নিয়েছে। ভালোবাসার আতিশয্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'আলিমুল গায়েব' (অদৃশ্যের সর্বজ্ঞানী) বা সৃষ্টির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে স্রষ্টার মর্যাদায় বসানোর মতো 'আক্বিদাহ্গত অতিরঞ্জন পরিলক্ষিত হয়, যা তাওহীদের মূল চেতনার বিপরীত।

তদুপরি, আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত 'জৌলুস' বা আতশবাজি, মাইকের বিকট আওয়াজ, গান-বাজনা, বিপুল অর্থ অপচয় এবং নফল উৎসবের ব্যস্ততায় জামা'আতে ফর্য সালাতের মতো মৌলিক বিধানগুলো উপেক্ষিত হওয়ার দৃশ্য অহরহ দেখা যায়। এমনকি যারা এই অনুষ্ঠানগুলো পালন করেন না, তাদেরকে ঢালাওভাবে 'নবীবিদ্বেষী' আখ্যা দেওয়ার মতো চরমপন্থাও সমাজে দানা বেঁধে উঠেছে। অথচ 'ইবাদতকে সামাজিক লৌকিকতায় রূপ দেওয়া এবং অন্যের ওপর ভ্রান্ত ফাতাওয়া চাপিয়ে দেওয়া শরীয়তের চরম লঙ্ঘন।[৩৬]

উপসংহার: ঈদে মিলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে আধুনিক সমাজে যে বাহ্যিক আড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিকতার প্রকোপ বাড়ছে, তা মূলত সুন্নাহর প্রকৃত ভাবগাম্ভীর্যকে উম্মাহর দৃষ্টির আড়ালে ঠেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ কোনো নির্দিষ্ট মাসের বা নির্দিষ্ট দিনের কয়েক ঘণ্টার বার্ষিক উদযাপনে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। একজন প্রকৃত মু'মিনের জীবনে নবীপ্রেম হলো– প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে তাঁর রেখে যাওয়া পবিত্র সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, তাঁর নিখাদ আখলাক নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করা। বিদআতের সকল কৃত্রিম ধুম্রজাল ছিন্ন করে সুন্নাহর আলোকোজ্জ্বল সরল-সোজা পথে ফিরে আসার মাধ্যমেই উম্মাহ তার হারানো একক 'আক্বিদাহ্ ও বিশ্বমঞ্চে স্বীয় আধ্যাত্মিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

---

[৩২] *সহীহ বুখারী- হা. ২৬৯৭।*
[৩৩] *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম- হাফিজ ইবনু কাসীর (*), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮-৯০।*
[৩৪] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩।*
[৩৫] *আল-ই'তিসাম- ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৫।*
[৩৬] *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম- ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (*), পৃ. ৩৯৫-৩৯৭।*

ইসলামী প্রবন্ধ / مقالات إسلامية

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

কে. এম আব্দুল জলিল*

ভূমিকা: ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি। আমাদের মানসিক সুস্থতা ও আবেগিক পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া নিঃশর্ত ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে আমরা নিজেদেরকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারি, তাঁরা আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে ওঠেন, মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শোনেন এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা দেন। ইসলাম পরিবারের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করে না; বরং ব্যক্তি ও পরিবারের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে। সর্বোপরি পরিবারের সকল বিষয়ে সঠিক ইসলামী নীতিমালা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান-ই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইসলামী পরিবার কাকে বলে?

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার শব্দটির আরবী পরিভাষা হলো– أُسْرَة (উসরা), এর অর্থ হচ্ছে- ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন এবং তার কাছের সম্পর্কের মানুষজন। পরিবারের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান ও নির্দেশনা অন্য যে-কোনো কিছুর চেয়ে অধিক সুন্দর, গোছালো, সুশৃঙ্খল, ভারসাম্যপূর্ণ, যৌক্তিক ও বাস্তবিক; যার অনুরূপ পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি কিংবা জনপদে পাওয়া যায় না। পরিবারের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ইসলামী সমাজকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾

“আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব।”[১]

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার: ইসলামের আদর্শ ও বিধিবিধানের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে উঠে ও পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী পরিবার বলে।

A Family that is established based on the ideals and rulies of Islam is called an Islamic family.

পরিবার হলো মানুষের সেই দল, যারা শারী‘আতের নীতিমালার আলোকে সংঘবদ্ধ থাকে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকে; যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ স্থায়ী হয় এবং সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। যেমন- আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।”[২] অন্যত্র বলেন,

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾

“অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তাঁর স্ত্রী-ব্যতীত। সে পেছনে অবস্থানকারীদের সাথে রয়ে গেল।”[৩] আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

অর্থাৎ- “আপনি নিকটতম আত্মীয়দের সর্তক করে দিন।”[৪]

অতএব, পারিবারিক বন্ধন থেকে বের হয়ে মানুষ কখনো সুখ লাভ করতে পারে না এবং বৈধ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে পারে না।

ইসলামে নারীর অধিকার: ইসলামে নারীর অধিকার অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, সম্মানজনক এবং ন্যায়ভিত্তিক, যা ১৪০০ বছর পূর্বেই নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী হিসেবে শিক্ষা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিয়ের সম্মতি এবং নিজস্ব উপার্জনের ওপর পূর্ণ অধিকারের পাশাপাশি মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে বিশেষ মর্যাদা পায়। ইসলামে সমতার পরিবর্তে “ন্যায্য অধিকার” (Equity) নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে নারীর আর্থিক দায়ভার না থাকলেও ভরণপোষণের অধিকার স্বীকৃত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পুরুষ যতই স্বনির্ভর হোক, নারী যতই স্বাবলম্বী হোক একজন স্বামীকে ছাড়া একজন স্ত্রী অসহায়, একজন স্ত্রীকে ছাড়া একজন স্বামী অসম্পূর্ণ। ইসলাম নারীদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন- আল্লাহর বাণী:

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾

“তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে।”[৫]

নারীর সাথে সদাচারণ করা, তাদের খোরপোশ বহন করা, তাদের উত্তরাধিকার দেওয়া-ইত্যাদি সহ নানা ক্ষেত্রে

**সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[১] *সূরা আদ-দাহর: ২৮।*

[২] *সূরা আত্-তাহরীম: ৬।*

[৩] *সূরা আল-আ’রাফ: ৮৩।*

[৪] *সূরা আশ্-শু‘আরা-: ২১৪।*

[৫] *সূরা লুক্বমা-ন: ১৪।*

ইসলাম নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট (Pierre Crabite) ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা মুহাম্মদ (ﷺ) সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে,

Muhammad was the world greatest champion of women's rights the world has ever seen.

মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন নারী অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যা পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি।[১]

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার: ইসলামী শরিয়ত ও আইন অনুযায়ী স্বামীর ওপর স্ত্রীর মৌলিক অধিকারগুলোর অন্যতম হলো ভরণপোষণ, মোহরানা আদায়, উত্তম আচরণ, নিরাপদ বাসস্থান এবং পারস্পরিক মর্যাদা। স্বামী নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর পোশাক, খাদ্য ও চিকিৎসার দায়িত্ব পালনে বাধ্য। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ ও উপহারের ওপর তার পূর্ণ অধিকার থাকে, যেখানে স্বামীর কোনো আইনগত অধিকার নেই। এই সমস্ত মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি ইসলাম বেশ কিছু কাজে স্বামীদেরকে আদেশ করেছে।

১) স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করা (Good behavior): স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তার সাথে নম্র আচরণ করা এবং তাকে খুশি রাখা স্বামীর কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো।"[২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "মু'মিনদের-মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"[৪]

কারণ স্বামীর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ববিষয় অন্যের কাছে গোপন থাকলেও স্ত্রীর কাছে তা স্পষ্ট-থাকে। তাই স্বামী বাস্তবে ভালো না হলে অন্যের দৃষ্টিতে যত ভালোই হোক স্ত্রীর কাছ থেকে ভালো হওয়ার সার্টিফিকেট কখনোই পাবে না। অনেকে বাইরে ভদ্রলোক, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে ভদ্রতার কোনো তোয়াক্কা করে না। সামান্য ব্যাপার-নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে, গাল-মন্দ করে, আবার অনেকে তাদের গায়ে হাত তোলে। অথচ রাসূল (ﷺ) তাদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করে বলেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করো না।[৫]

২) স্ত্রীর মোহর আদায় করা: মোহর মূলত একটি সম্মানী যা দ্বারা স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী মোহর নির্ধারণ করা সবচেয়ে উত্তম, যতটকু মোহর নির্ধারণ করা হবে তা পরিপূর্ণ আদায় করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

"তোমরা খুশিমনে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করো।"[৬]

৩) স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা: ইসলাম স্বামীকে হালাল অর্থ দ্বারা সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছে। শরীয়তের কোথাও স্ত্রীকে চাকরি করা বা অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।"[৭]

তাছাড়া-কেউ কারো সেবায় নিয়োজিত থাকলে তার সর্ববিধক খরচাদি সেবা গ্রহণকারীর ওপরই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং স্ত্রীর বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। আরাফার ময়দানে বিদায়ী ভাষণে এবং জীবনের অন্তিম সময় রাসূল (ﷺ)-এর যবান আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল, আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখনো তিনি বলেছিলেন, "স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তারা তোমাদের হাতে আবদ্ধ।"[৮] সাহাবী মু'আবিয়াহ্ ইবনু হায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমাদের প্রতি আমাদের স্ত্রীদের কী কী অধিকার রয়েছে? রাসূল (ﷺ) বললেন, যখন তোমরা খাবে তাদেরকেও খাওয়াবে, যখন তোমরা পরিধান করবে তাদেরকেও পরতে দিবে।[৯] আর পোশাকাদীর ক্ষেত্রেও শরীয়তের সীমারেখা ও স্বামীর সামর্থ্যের মধ্যে থেকে স্ত্রীর রুচি পছন্দের খেয়াল রাখা জরুরি।

৪) স্ত্রীকে দ্বীনি বা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান: স্বামীর কাছে স্ত্রীর যেমন জৈবিক অধিকার রয়েছে তেমনি ধর্মীয় অধিকারও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[১] *প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা, কালের কণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।*
[২] *সূরা আন্-নিসা: ১৯।*
[৩] *ইবনু মাজাহ্- ১৯৭৭; তিরমিযী- ৩৮৯৫, আলবানী সহীহ।*
[৪] *সুনানে তিরমিযী- হা. ১১৬২।*
[৫] *সুনানে আবূ দাউদ- হা. ২১৪৬।*
[৬] *সূরা আন্-নিসা: ৪।*
[৭] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৩৩।*
[৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২০৬৯৫।*
[৯] *সুনানে আবূ দাউদ- হা. ২১৪২।*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।"[১] রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"পুরুষ তার পরিবারের যিম্মাদার, তাকে তার পরিবার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[২]

তাই বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষের কর্তব্য হলো, দ্বীনদার নারী বিবাহ করা। তাহলে স্ত্রী স্বেচ্ছায় দ্বীনের ওপর চলবে। আর যদি অশিক্ষিত বা জেনারেল শিক্ষিত নারী বিবাহ করা হয় তাহলে তাকে সালাত-সিয়াম, মাসআলা-মাসাইল, 'ইবাদত-বন্দেগী হায়েয-নিফাস প্রভৃতির বিধান, শিরক-বিদ'আত ও রুসুমাত পরিহার করা ইত্যাদি বিষয়ক ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া স্বামীর জন্য আবশ্যক। অন্যথায় দুনিয়াতে চরম অশান্তি সৃষ্টি হবে আর পরকালেও ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

৫) স্ত্রীর চারিত্রিক বিষয় সুন্দর ধারনা রাখা: অনেকে স্ত্রীর চারিত্রিক বিষয়ে অহেতুক সন্দেহ করে, তার প্রতি মন্দ ধারণা রাখে। এটা গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না।"[৩]

এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, বিবাহের পূর্বে সর্ববিষয়ে সাধ্যানুযায়ী যাচাই-বাচাই করা। বিবাহের পরে শুধু স্পষ্ট দলিল ব্যতীত স্ত্রীর প্রতি কোনো মন্দ ধারণা না করা; বরং নিজের জীবনের অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা। আর এই বিশ্বাস রাখা যে, যে স্ত্রী আমার জন্য কল্যাণকর আল্লাহ আমার জন্য তাকেই বরাদ্দ করেছেন। অতএব আমি তাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾

"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য। দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।"[৪]

[১] *সূরা আত্-তাহ্‌রীম: ৬।*
[২] *সহীহ বুখারী- হা. ৫২০০, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা. ৭১৩৮।*
[৩] *সূরা আল- হুজুরা-ত: ১২।*
[৪] *সূরা আন্-নূর: ২৬।*

অতএব আশা করা যায়, আমি যদি সৎচরিত্রের অধিকারী হই তবে আমার স্ত্রীও সচ্চরিত্রা হবে।

৬) স্ত্রীর মান-অভিমান: ইসলাম স্বামীর সাথে স্ত্রীর মান-অভিমানের অধিকার দিয়েছে। নারীদের বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "হে পুরুষগণ। তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কল্যাণের অসিয়ত গ্রহণ করো। নিশ্চয় তাদেরকে পাঁজরের বক্র হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে যাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে।"[৫] অপর এক হাদীসে রাসূল (ﷺ) নারীদের জ্ঞান, বুদ্ধি কম বলে অবহিত করেছেন। তাই পুরুষদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে। স্ত্রীদের বক্রতা আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য্য মনে করতে হবে। তাদের মান-অভিমান সয়ে যেতে হবে। একবার রাসূল (ﷺ)-এর এক স্ত্রী 'আয়িশাহ্ সিদ্দীকার ঘরে রাসূলের জন্য একটা বাটিতে কিছু হাদিয়া পঠিয়েছিলেন। এদিকে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ঘরে অন্য স্ত্রীর হাদিয়া পাঠানোতে তার অভিমান হলো। তাই 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) খাবারের পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন। কিন্তু রাসূল (ﷺ) এতে ক্ষিপ্ত হলেন না; পড়ে যাওয়া খাবারগুলো নিজ হাতে একত্রিত করলেন এবং সেই পাত্রের পরিবর্তে আরেকটি পাত্র দিয়ে খাদেমকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের মায়ের আভিমান হয়েছে।[৬]

৭) স্ত্রী সুন্দরী নয় বা অপছন্দনীয়: কারো স্ত্রী অসুন্দর, বেঁটে বা অপছন্দনীয় হলে এমন কারণে যদি পরনারীর প্রতি মন আকৃষ্ট হয় তাহলে ভাবা উচিত যে, আমার পাপের কারণে হয়তো আল্লাহ আমার জন্য এই স্ত্রী বরাদ্দ করেছেন। আর সে তার নেক 'আমলের কারণে আমার মতো সুদর্শন স্বামী পেয়েছে। তাহলে আমি হলাম তার নেক 'আমলের প্রতিদান আর সে হলো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তাছাড়া সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি দোষ-গুণ আল্লাহর দান। তাতে স্ত্রীর কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যদি তার স্থানে আমাকে সৃষ্টি করতেন তখন আমারই বা কি করার ছিল। বা এখনো যদি আমার সৌন্দর্য্য কেড়ে নেন, বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু করে দেন তাহলে আমার কি করার থাকবে? তাই এখানেও ধৈর্য্য ধারণ করা জরুরি। পরস্ত্রীর প্রতি মন আকৃষ্ট হলে ইসলামের নির্দেশ হলো নিজ স্ত্রী নিয়ে মশগুল হয়ে যাওয়া। কারণ হিসেবে হাদীসে বলা হয়েছে, "উক্ত নারীর সাথে যা আছে নিজ স্ত্রীর মাঝেও তাই আছে। অতএব পেরেশান হওয়ার কিছু নেই।"[৭] স্মরণ রাখতে হবে, একটি মেয়ে তার বাবা-মা, ভাই-বোন সকলকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এখন স্বামীই তার একমাত্র আপনজন। সে স্বামীই যদি তার

[৫] *সহীহ বুখারী- হা. ৫১৮৬।*
[৬] *সহীহ বুখারী- হা. ৫২২৫।*
[৭] *সুনানে দারিমী- হা. ২৩৮৮।*

দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার জীবনে সুখ পাওয়ার আশা সে আর কার কাছ থেকে করবে।

৮) স্ত্রী নিঃসন্তান বা কন্যা সন্তান দানকারী হওয়া: স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হলে অথবা কেবল কন্যা সন্তান হলে অনেকেই স্ত্রীকে দোষারোপ করে। অথচ পুত্র বা কন্যা সন্তান দান করা স্ত্রীর আয়ত্তধীন নয়; বরং পুত্র-কন্যা একমাত্র মহান আল্লাহরই দান। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"[১]

তাই আল্লাহ তা'আলা যা দান করেন কন্যা হোক বা পুত্র, তা নিয়েই সন্তুষ্টি থাকা চাই। স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বা নির্যাতন করা অন্যায়। এক্ষেত্রে দু'আ করা যেতে পারে, হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি যে নেক সন্তানের সিদ্ধান্ত করেছ তা আমাকে দান করো।

৯) তালাক প্রসঙ্গ: স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয় শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপন করতে না চায় তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইসলাম কয়েকটি কার্যকরী নীতিমালা প্রয়োগের আদেশ করেছে। সেসব অতিক্রম ব্যতীত তাকে তালাক দেয়া শরীয়তসম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

"তোমরা যে সকল স্ত্রীদের অবাধ্য হওয়ার আশঙ্কা করো তাদেরকে উপদেশ দাও, তারপর শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে (শর্ত সাপেক্ষে) শাসন করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অন্বেষণ করো না।"[২] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যথা-

১. উপদেশের মাধ্যমে বুঝিয়ে সংশোধন করা।

২. প্রয়োজনে গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্যে তার সাথে শয্যা ত্যাগ করা।

৩. প্রয়োজনে পূর্বে উল্লিখিত পন্থায় দৈহিক হালকা শাসন করা। তারপরেও যদি সংশোধন না হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষ থেকে দু'জন মালিক (তৃতীয় পক্ষ) নির্ধারণ করে তাদের মাধ্যমে সমঝোতা করার চেষ্টা করা। যদি তারপরও পরস্পরে সমঝোতা না হয়। সমাধানের চারটি পন্থাই ব্যর্থ হয় তাহলে বিজ্ঞ কোনো আলেম বা মুফতীর শরণাপন্ন হয়ে এক তালাক প্রদান করা। তারপরও যদি সঠিক পথে না আসে তাহলে পুনরায় দ্বিতীয় তালাক, তারপর না হলে শেষ পর্যায়ক্রমে তৃতীয় তালাক প্রদান করা।

উপরোক্ত ধাপসমূহ পার হবার পূর্বে কোনো অবস্থায়ই স্ত্রীকে তালাক দেয়া শরীয়তসম্মত নয়। অথচ বর্তমানে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর কোনোই গুরুত্ব দেখা হয় না। কথা কাটাকাটি আর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তালাক দেয়া হয় বা শরঈ প্রয়োজন ও যোগ্যতা ছাড়াই শুধু প্রথম স্ত্রীর প্রতি রাগ মিটানোর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করে প্রথম স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া শুরু করে, এ সবই অপরিপক্ক অবলা নারীর প্রতি যুল্ম ও অন্যায়। উল্লেখ্য, বিবাহের যেমন সুন্নাহ পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি তালাকেরও সুন্নাহ পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে তালাক দিলে, তা সুন্নাহ পদ্ধতিতে তালাক বলে গণ্য হবে। যেমন-

১. তালাক কোনো প্রাথমিক সামাধান নয়। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য সকল পদ্ধতিতে সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সর্বশেষ উপায় হিসাবে তালাক দেয়া উচিত।

২. এমন অবস্থায় তালাক না দেওয়া, যখন তালাক দিলে তা যুল্ম হয়ে যায়।

৩. স্ত্রী-গর্ভবতী, নিফাসরত কিংবা হায়িজরত অবস্থায় থাকাকালে তালাক না দেওয়া।

৪. হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তালাক দেয়া।[৩]

১০) প্রেম ও রোমান্টিকতা: স্ত্রীর সাথে সবসময় ভালোবাসার কথা বলা, প্রেম ও রোমান্টিকতা দিয়ে তাকে ভরপুর করে রাখা তো একমাত্র স্বামীর দায়িত্ব। এ পবিত্র গুরুদায়িত্বে গাফলতি করলে স্ত্রী বিপথগামী হতে পারে। স্ত্রীর Recreation বা চিত্তবিনোদনের জন্য ঘুরতে পছন্দ করলে নিজের অপছন্দ হলেও তাকে মাঝে মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, দূরে কোথাও ভ্রমনে চলে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও তাঁর স্ত্রীদের সফরে নিয়ে যেতেন। 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ঋতুবর্তী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী (ﷺ)-কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, তিনিও পাত্রের সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুবর্তী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী (ﷺ)-কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।"[৪]

১১) স্ত্রীর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি মমত্ববোধ: স্বামীর পরিবার ও প্রিয়জনদেরকে আদর-আপ্যায়ন করা ও ভালোবাসা যেমন স্ত্রীর দায়িত্ব, তেমনি স্ত্রীর পরিবার ও প্রিয়জনদেরকে উত্তমরূপে আতিথেয়তা ও আদর যত্ন করাও স্বামীর দায়িত্ব।

---

[১] *সূরা আশ্-শূরা-: ৪৯।*

[২] *সূরা আন্-নিসা: ৩৪।*

[৩] *মু'মিনের পারিবারিক জীবন- ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও ফয়সাল বিন আলম, ঢাকা: তাইবাহ একাডেমি, ২য় সংস্করণ, ২০২৪, পৃ. ২৭৭।*

[৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫৭৯।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাদীজাহ্ (رضي الله عنها) মৃত্যুর পরও তাঁর বান্ধবীদের খোঁজ খবর নিতেন ও তাদের জন্য খাবার পাঠাতেন এ প্রসঙ্গে মা 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন, "আমি খাদীজাহ্ ব্যতীত নবী সহধর্মিনীদের আর কারো প্রতি ঈর্ষান্বিত হইনি, অথচ আমার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বকরি যাবেহ করতেন তখন বলতেন, এর গোশ্ত খাদিজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও।" একদা আমি তাঁকে রাগিয়ে দিলাম এবং বললাম, খাদীজাকে এতই ভালোবাসেন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেন, "তার প্রতি ভালোবাসা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।"[১]

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার: স্বামীর ওপর যেমন বেশ কিছু দায়িত্ব ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তেমনি স্ত্রীর ওপর স্বামীর বেশ কিছু অধিকার ইসলাম ঘোষণা করেছে। যেমন-

১) স্বামীর আনুগত্য করা: স্বামীর নির্দেশ মান্য করা, তার অনুগত থাকা যে কোনো স্ত্রীর জন্য আবশ্যক, যদি না তা মহান আল্লাহর আদেশ বিরোধী হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কোনো নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, ফরয সিয়াম পালন করে, সতিত্বের সংরক্ষণ করে ও স্বামীর অনুগত থাকে তা হলে তাকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।"[২] তিনি আরো বলেন, "যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ্ করতে আদেশ করতাম, তা হলে নারীদের আদেশ করতাম যেন তারা তাদের স্বামীদের সিজদাহ্ করে।"[৩]

২) স্বামীর হক্ব আদায় করা: স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ ব্যাপারে স্ত্রীগণকে বহু জায়গায় সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষত স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণ করা স্ত্রীদের জন্য আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তা হলে ফেরেশ্তাগণ তাকে (স্ত্রীকে) সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকেন।"[৪] মর্যাদাবান সাহাবী আনাস (رضي الله عنه)'র মা উম্মু সুলাইম রুমাইসাহ্ বিনতু মিলহান (رضي الله عنها)'র জীবনীতে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে। তিনি তাঁর স্বামী আবূ ত্বালহাহ্'র সাথে অত্যন্ত গভীর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতেন না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ তালহার একটি শিশু পুত্র অসুস্থ ছিল। আবূ ত্বালহাহ্ তখন সফরে ছিলেন, তিনি যেদিন ঘরে ফিরলেন, ঐদিনই শিশু পুত্রটি মৃত্যুবরণ করলো, রুমাইসাহ্ বাড়ির সকলকে বললেন, আমার আগে যেন আবূ তালহাকে শিশুর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান না করে। আবূ তালহাহ্ ঘরে প্রবেশ করে শিশুটির কথা জিজ্ঞেস করলেন। রুমাইসাহ্ (رضي الله عنها) বললেন, শিশুটি খুব শান্ত আছে। এতে আবূ তালহাহ্ মনে করলেন, অসুস্থ শিশুটি ভালো হয়ে গেছে এবং আরামে ঘুমাচ্ছে। রুমাইসাহ্ তাঁর স্বামীকে খাবার দিলেন, অতঃপর স্বামীর জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর স্বামীর সাথে রাত্রি যাপন করলেন। স্বামী-স্ত্রীতে সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই হলো। সকাল হলে রুমাইসাহ্ বললেন, হে আবূ তালহাহ্ তোমার কাছে যদি কেউ কিছু আমানত রাখে। আর সে যদি তোমার কাছে সেই আমানত ফেরত নিতে চায়, তাহলে কি তুমি তা আটকিয়ে রাখতে পারবে? তিনি বললেন, না অবশ্যই আমানত ফিরিয়ে দিতে হবে। তখন রুমাইসাহ্ বললেন, তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার পুত্র আল্লাহর নিকট চলে গেছে। এই কথা শুনে তিনি (আবূ ত্বালহাহ্) মন খারাপ করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে রাতের ঘটনা সম্পর্কে জানালেন, নবী করীম (ﷺ) তখন বললেন,

بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِيْ لَيْلَتِكُمَا.

অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'আলা আজ রাতে তোমাদের দু'জনের মধ্যে প্রচুর বরকত দান করেছেন।"[৫]

অতঃপর রুমাইসাহ্ 'আব্দুল্লাহকে গর্ভে ধারণ করলো এবং কোনো এক রাতে তাকে জন্ম দিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ'র আগেই অন্য কেউ তাকে মিষ্টিমুখ করাক এটা সে অপছন্দ করলো।[৬] অতঃপর উম্মু সুলাইম ও আবূ ত্বালহার এই কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে অনেকগুলো সৎ পুত্র সন্তান দান করেছেন। তাদের মধ্য থেকে দশজন আল-কুরআনের হাফিয হয়েছিলেন। মা 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (ﷺ) একবার বলেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আবূ ত্বালহার স্ত্রী রুমাইসাকে দেখতে পেয়েছি।"[৭]

৩) নিজের সতীত্ব রক্ষা করা, ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করা: একজন স্ত্রী তার স্বামীর আমানত। আর এ আমানত রক্ষা করা স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ। যেমন- আল্লাহ বলেন:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬১৭২।*
[২] *আল-মুসনাদ- হা. ১৬৬১। হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী। সূত্র: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা।*
[৩] *সুনান আবী দাঊদ- হা. ২১৪০, আলবানী সহীহ।*
[৪] *সহীহ আল-বুখারী- হা. ৩২৩৭।*
[৫] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১২০২৮।*
[৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৩৯; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১২০২৮।*
[৭] *বুখারী- আল-ইসবাহ ফী তামঈযিস সাহাবা; উসুদুল গাবাহ।*

"পুরুষরা নারীদের কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্যে যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই পূণ্যশীল স্ত্রীরা অনুগত এবং লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহর হেফাযতে তারা হেফাযত করে।"[১] নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

মোটকথা: ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর ওপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাকে তার স্বামীর যে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। আর সে আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি দয়াবান থাকবে, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট করার কারণে আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।[২]

৪) স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করা: স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয় বিষয় কখনই মানুষের কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়, সে যত অন্তরঙ্গই হোক না কেন। কেননা এতে একদিকে আমানতের খেয়ানত, অন্যদিকে সম্পর্ক নষ্ট হয়, আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানত খিয়ানতকারী যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।[৩] দাম্পত্য সম্পর্ক এমন, যেখানে আল্লাহ দু'জনের মধ্যে কোনো আড়াল রাখেননি। সে নিবিড় ঘনিষ্টতা একান্তই তাদের নিজস্ব ভূবন। এখানে যেমন অন্যের কোনো প্রবেশাধিকার নেই, তেমনি তাদেরও সেখানে অন্য কাউকে টেনে আনার সুযোগ নেই। অর্থাৎ- তাদের একান্ত ঘনিষ্টতা ও অন্যসব গোপনীয় বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে এ অঙ্গনের সঙ্গে পরিচিত করা কোনোক্রমেই জায়িয নয়, এটা এক রকম বিশ্বাসঘাতকতা। এটা অঙ্গীকার ভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।[৪]

৫) স্বামীর আনুগত্য করা: দাম্পত্য জীবনে সুখের মূল ভিত্তি হলো একজন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি সদা অনুগত থাকবে। শারঈ নির্দেশনা অনুসারে স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগত থাকে তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন হবে সুখোময়, আল্লাহ স্বামীকে পরিবার প্রধান বানিয়েছেন, পরিবারের পরিচালনা ও দায় তার উপরেই ন্যস্ত করেছেন। আর স্ত্রীকে বানিয়েছেন সহকর্মী, সহযোগী, তাই স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালনে সম্মান-অসম্মানের কিছু নেই। স্বামীর আনুগত্য করার অর্থ হচ্ছে, তিনি যা আদেশ করবেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করবেন তা থেকে বিরত থাকা। তবে শারঈ বিধানের পরিপন্থি কোনো বিধান পালন করবেন না। যেমন- শির্ক, বিদ'আত করার আদেশ দিলে তা পালনীয় হবে না। আল্লাহর নির্দেশ ও মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নির্দেশনা মেনে চললে সংসার হবে জান্নাতের টুকরার মতো। সুখের স্নিগ্ধতা ঝরে ঝরে পড়বে পরিবারে। ফুটন্ত গোলাপের মতো সুরভিত হয়ে উঠবে দাম্পত্য জীবন, তাই স্বামীর ঘরে পাঠানোর পূর্বেই অতীতে মায়েরা স্বীয় কন্যাদের মনে করিয়ে দিতেন এ মূল্যবান নির্দেশনা। কন্যার প্রতি এমন বহু আলোকিত নসীহতে ভরপুর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতা। আওফ আশ-শায়বানীর মেয়ের বিয়ে হলে স্বামীর হাতে মেয়েকে তুলে দেয়ার মুহূর্তে মা উসামাহ্ বিনতু হারেস মেয়েকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন, মেয়ে আমার! যে ঘরে তুমি বেড়ে উঠেছ, খুশি ও আনন্দে যাকে ভরে রেখেছ সে ঘর ছেড়ে অপরিচিত ঘরে অপরিচিত একজন মানুষের কাছে তুমি যাচ্ছ। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার কয়েকটি নসীহত মনে রেখো। এগুলো তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। (তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নসীহত ছিল) স্বামী তোমাকে কোনো আদেশ করলে কখনো তা অমান্য করবে না এবং তার ব্যক্তিগত কোনো কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। মনে রাখবে, নিজের চাওয়া ও চাহিদার ওপর স্বামীর চাওয়া ও চাহিদাকে প্রাধান্য না দেয়া পর্যন্ত তুমি কখনো তার মন জয় করতে পারবে না। তুমি যদি তার দাসী হও তাহলে সে তোমার দাস হবে।[৫] পারিবারিক অবকাঠামো ও নেতৃত্বে স্বামীকে পরিবারের কর্তা বা দায়িত্বশীল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾

অর্থাৎ- "পুরুষরা নারীদের কর্তা।"[৬]

এই কাঠামোগত শৃঙ্খলার জন্য স্ত্রীর আনুগত্য অপরিহার্য, যা পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপসংহারে বলা যায়- পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সহনশীলতা বজায় রেখে সুখের সংসার গড়া। দায়িত্বগুলো বোঝা নয়; বরং ভালোবাসার বন্ধনে থেকে একে অপরকে সাহায্য করা এবং মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করাই দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

[১] *সূরা আন্-নিসা: ৩৪।*
[২] *কুরআনুল কারীম- বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ১ম খণ্ড, বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, সৌদি আরব, পৃ. ৪১২।*
[৩] *আল-মুসনাদুস সহীহ- ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ), অধ্যায়: বিবাহ-শাদী, হা. ৩৪১২।*
[৪] *হাদীসের ব্যাখ্যা- সূত্র: রিয়াদুস সালিহীন, অনুবাদ: মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (হাফিযাহুল্লাহ)।*
[৫] *মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম ইবনু হাস্সানান, দুরূস লিশ-শায়খ মুহাম্মদ হাস্সান, ৪৩/১২/, পৃ.; আবদে রাব্বিহী, আল-ইকদুল ফারীদ, ৩/১৯১; আল-মুসতাতরাফ- ২/১৮৪।*
[৬] *সূরা আন্-নিসা: ৩৪।*

সূচীপত্র

التربيةوالحضارة / শিক্ষা ও সভ্যতা

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[চতুর্থ পর্ব]

অনেক সময় অত্যাধুনিক আবিস্কারের ফলে হতবিহ্বল মানুষ বিজ্ঞান ও ইসলামের মাঝে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পান না। তারা ইসলামকে বিজ্ঞান বিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করেন। কিন্তু ইতিহাস তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। ইসলাম প্রকৃতির রহস্য অনুধাবন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকে সত্য উৎসাহিত করেছে। গনিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ণ ও প্রকৌশলজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন মুসলিম মনীষীবৃন্দ। ইসলামসমূহ প্রযুক্তি যা মানবকল্যাণে নিবেদিত –এর সবই সমর্থন করে। তবে প্রযুক্তির অপব্যবহার. যেমন- সাইবার অপরাধ, নজরদারির অপরাধ বা ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ইসলামের নৈতিক শিক্ষার পরিপন্থি। কুরআনুল কারীমে বিঘোষিত হয়েছে যে,

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের গোপন বিষয়ে অনুসন্ধান করো না।"[১] দয়ার নবীর বাচনিক উদ্ধৃতি সূত্রে জানা যায় যে,

"তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না।"[২]

আজকাল রাষ্ট্রীয়ভাবে আড়িপাতার জন্য নানা যন্ত্র আবিস্কার হয়েছে। যেমন- IMSI Catcher[৩] (Stingray/Cell-site Simulator Gelle Brite UFED, Fin Fisher, Predator, Deep Pocket Inspection (DPI) GPS ট্র্যাকার ইত্যাদি। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার প্রধান শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে IMSI Catcher, P6 intercept, Pegasus[৪] প্রভৃতি নজরদারি প্রযুক্তি সংগ্রহের অভিযোগ এসেছে। অথচ ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে, সমাজ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড হিসেবে, দেড়হাজার বছর আগে ঘোষিত হয়েছে– যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কথা তাদের অপছন্দ সত্ত্বেও গোপনে শ্রবণ করে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।[৮]

আধুনিক সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মানবাধিকার (Human Rights) ও মানবমর্যাদার (Human Dignity) স্বীকৃতি। ইসলাম ও মানুষের মর্যাদাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ﴾

"নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"[৯]

অনুরূপ অসংখ্য আয়াত[১০] দ্বারা মানুষের জীবন, ধর্ম, সম্পদ, সন্তান ও স্বাধীনতার সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মহানবী (ﷺ)-এর বাচনিক উদ্ধৃতি আমরা জানতে পাই।

"নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান এগুলো পরস্পরের জন্য পবিত্র।"[১১]

পরস্পরের প্রতি সম্মান অধিকার সুরক্ষা সংবলিত আর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য সেটি হলো–

---

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, সোস্যাল সায়েন্স ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

[১] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ১২।*

[২] *বুখারী- ৬০৬৪; মুসলিম- ২৫৬৩।*

[৩] *মোবাইল ফোনকে ভূয়া সেল টাওয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত করে অবস্থান শনাক্ত এবং কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগ হস্তক্ষেপ বা তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়।*

[৪] *এটি যন্ত্র নয়; ইসরাঈলী প্রতিষ্ঠান NSO Group-এর তৈরি একটি স্পাইওয়্যার (সফ্টওয়্যার), যা সংক্রমিত স্মার্টফোন থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।*

[৮] *বুখারী- ৭০৪২।*

[৯] *সূরা বানী-ইস্রা-ঈল: ৭০।*

[১০] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২; সূরা আন্-নিসা: ১৩৫; সূরা আল-হুজুরা-ত: ১৩; সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৫৬।*

[১১] *বুখারী- ১৭৩৯, মুসলিম- ১৬৭৯।*

[১২] *বুখারী- ১০; মুসলিম; ৪০।*

“মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।”[১২] ইসলামে জীবন, সম্পদ, ধর্ম, বুদ্ধি ও বংশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এসব নীতি দৃঢ়ভাবে আধুনিক মানবাধিকার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের ভিত্তি। ইসলামও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জ্ঞানার্জনকে উৎসাহিত করেছে। মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্র জ্ঞানচর্চার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবম শতকে ফাতিমা আল ফিহরি নাম্নী জনৈক দানশীল মুসলিম রমণী প্রতিষ্ঠিত কারা উইনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সমকালীন যুগে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কুরআন, তাফসির, হাদীসশাস্ত্র, ফিকহ, আরবি ভাষা সাহিত্য, ‘আক্বিদাহ্ ও কালাম, যুক্তি ও দর্শন, গণিত জোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যকার বিষয়ে বিস্তর জ্ঞানানুশীলন হতো। ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে জ্ঞানচর্চার বাতিঘরে পরিণত করে। এখান থেকে আলেম, বিচারক, ভাষাবিদ ও বিজ্ঞানী শিক্ষা লাভ করে। উত্তর আফ্রিকা, আন্দালুস (স্পেন) ও ইউরোপে জ্ঞান বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানচর্চার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে।

মুসলিম শাসকরা বিভিন্ন নগরে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, দামেস্ক ও সমরকন্দের গ্রন্থাগারগুলোতে লক্ষাধিক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। ‘আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ এবং বিশেষতঃ আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে বায়তুল হিকমাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে গ্রন্থাগার, অনুবাদ ব্যুরো, মানমন্দির এবং গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিক, পারস্য, ভারতীয় ও সিরীয় ভাষার দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বহু গ্রন্থ আরবিতে অনুদিত হয়। মুসলিম শাসকরা শুধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণই করেননি আলেম, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের বৃত্তি, সম্মানী এবং গবেষণার সুযোগ প্রদান করতেন। ফলে ইবনে সিনা, আল বিরুনী, আল খাওয়ারিজমি, ইবনু আল হায়সাম প্রমুখ বিশ্বখ্যাত মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। এই সকল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্কৃতির বিকাশে আমরা দেখতে পাই।

আধুনিক অর্থনীতি উৎপাদন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। ইসলামও অনুরূপভাবে যেমন- বৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্য, শ্রমের মর্যাদা ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনকে সমর্থন করে। একই সঙ্গে যাকাত, সাদাক্বাহ্ ও ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। একটা টেকসই সভ্যতার উন্নয়ন সাধনের জন্য ইসলাম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় বিচারকে গুরুত্ব দেয়।

গণতন্ত্র পরামর্শ ও জবাবদিহিতা, আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে এর মূল্য অপরিসীম। ইসলামেও প্রচলিত গণতন্ত্রের মত না হলেও (পরামর্শ/শুরা) নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মৌলিক ভিত্তি। কুরআনুল কারীমে এতদবিষয়ে ইঙ্গিতবাহী আয়াত দৃষ্ট হয়। সেখানে বলা আছে,

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

“তাদের কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।”[১]

জবাবদিহিতার প্রশ্নে রাসূলের বাচনিক উদ্ধৃতিতে জানা যায় যে, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। শাসক একজন দায়িত্বশীল, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এতে প্রতিভাত হয় যে, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ন্যায় ইসলামের মাঝে গণতন্ত্র, পরামর্শ ও জবাবদিহিতার সুযোগ আছে। যদিও আধুনিক গণতন্ত্র ও ইসলামী শুরা অভিন্ন নয়।

রাসূল (ﷺ) ওহী প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। বদর, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধে তিনি সাহাবাদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। তবুও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ন্যায় বিচার ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

---

[১] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ৩৮।*

নৈতিকতা বিবর্জিত আধুনিক সভ্যতার অনেক অর্জন সত্ত্বেও ভোগবাদ, পারিবারিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ও পরিবেশ ধ্বংসের মতো সমস্যা ক্রমবর্ধমান। এগুলো একটা টেকসই সভ্যতার উপাদান নয়। এক্ষেত্রে ইসলাম নৈতিক সংযম, পরিবার ব্যবস্থার সুরক্ষা, সামাজিক দায়িত্ব এবং মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার সাক্ষ্য দেয়। নৈতিকতা বলতে মানুষের উত্তম চরিত্র, সদাচারণ, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, দয়া, আমানতদারিতা, শালীনতা এবং আল্লাহ ও মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণকে বোঝায়, ইসলামে টেকসই সভ্যতার বিকাশে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক সভ্যতায় তা চর্চিত না হলেও এসবের মেকি (Fake) অনুশীলন সমাজ-সভ্যতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে।

আধুনিক সভ্যতায় প্রচলিত সীমাহীন ভোগবাদ ও বস্তুবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার ভুল ব্যাখ্যা, নৈতিকতার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে সভ্যতার তথাকথিত উন্নতি হলেও সমাজের অস্থিরতা মানব সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। নৈতিকতার অভাবে পরিবার ও বিবাহ প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে সভ্যতার নির্যাসে তিক্ততা দেখা দিয়েছে। ইসলামের মতে উন্নয়ন তখনই প্রকৃত, যখন তা নৈতিকতা, ন্যায়-বিচার এবং মানব কল্যাণের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) জৈবপ্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং নৈতিক সংকটের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবকেন্দ্রিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (ﷺ) মদিনার লোকদের খেজুর গাছে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে দেখে মন্তব্য করেন যে, তারা যদি এটি না করত তাহলে হয়তো ভালো ফল হতো। সাহাবিরা তাঁর কথা শুনে পরাগায়ন করা বন্ধ করেন। ফলে সেই বছর খেজুরের ফলন কমে যায়। বিষয়টি তিনি অবগত হলে তিনি বলেন: তোমরা দুনিয়াবি বিষয়গুলো সম্পর্কে অধিক ভালো জানো। এতে প্রমাণিত হয় যে, বৈষয়িকসমূহ কল্যাণ ও অগ্রগতির স্বার্থে কৃষি, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাসহ অভিজ্ঞতা নির্ভর দুনিয়াবি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান, গবেষণা ও প্রয়োগের গুরুত্ব ইসলাম স্বীকার করে। ইসলামের মাকাসিদুশ শরীয়াহ (শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য)- জীবন, ধর্ম, বুদ্ধি, বংশধারা ও সম্পদের সুরক্ষা টেকসই উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি, বিশ্বায়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈব প্রযুক্তি, ডিজিটাল যোগাযোগ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে মানবসভ্যতা নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে, এসব পরিবর্তন যেমন উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, তেমনি নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক নতুনভাবে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সমকালীন বিশ্বের বহু সমস্যার কার্যকর সমাধানের সম্ভাবনা ধারণ করে।

আধুনিক বিশ্বের অনেক সমাজে ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যার প্রবণতা দেখা যায়। ক্রমে ধর্মের নামে ভাওতায় বিরক্ত তরুণ সমাজ ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রাহ্য মনে করেছে। এর ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার সামগ্রিক বিশ্বাসী হওয়ার এই প্রবণতা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আধুনিক সভ্যতার অন্যতম সংকট হলো সীমাহীন ভোগবাদ ও ভোক্তা কেন্দ্রিক জীবনধারা। সম্পদ ও ভোগকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করার ফলে নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ দুর্বল হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অবগত হওয়া যায় যে, ব্যাংকে জমা মোট আমানতের প্রায় ৪০% অর্থ কোটিপতি হিসাবধারীদের হাতে রয়েছে। কোটিপতি এবং উচ্চসম্পদশালী হিসাবধারীদের মিলিয়ে মোট আমানতের প্রায় ৯৬% তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

قصص الحديث / ক্বাসাসুল হাদীস

হাজার ঋণের বিরল ঘটনা

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, বানী ইস্‌রাঈলের কোনো এক ব্যক্তি বানী ইস্‌রাঈলের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দ্বীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বললো, কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে এসো, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব।

সে বললো, সাক্ষী হিসাবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট।

তারপর (ঋণদাতা) বললো, তা হলে একজন যামিনদার উপস্থিত করো।

সে বললো, যামিনদার হিসাবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট।

ঋণদাতা বললো, তুমি সত্যই বলেছ।

এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দ্বীনার দিয়ে দিলো।

তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করলো এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোনো যানবাহন পেলো না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করলো এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দ্বীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বললো, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি অমুকের নিকট এক হাজার দ্বীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, মহান আল্লাহই যিম্মাদার হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাজী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসাবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট, তাতে সে রাজী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করলো।

অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়তোবা ঋণগ্রহীতা কোনো নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির ওপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্ঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানীর জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল।

কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দ্বীনার নিয়ে এসে হাযির হলো এবং বললো, আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোনো নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বললো, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে?

ঋণগ্রহীতা বললো, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোনো নৌযান আমি পাইনি।

সে বললো, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তা'আলা তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দ্বীনার নিয়ে ফিরে চলে এলো।[১]

শিক্ষণীয় বিষয়:

০১. এমন সৎব্যক্তিদের উপস্থিতি পূর্ব যুগেও ছিল যারা আমানতদারিতায় অত্যান্ত আল্লাহভীরু/অধিক যত্নবান ছিলেন।

০২. যারা আমানতদারিতা রক্ষা করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদের আমানতদারিতা রক্ষা করতে সহযোগীতা করেন।

০৩. ধর্মীয় বিধি-বিধানকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

০৪. আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির অভিভাবক হন যে তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক ও স্বাক্ষীরূপে বেছে নেয়।

০৫. মহান আল্লাহর ওপর ভরসার প্রতিফল, সকল বিষয় মহান আল্লাহর হাতে অর্পণ করা এবং পাশাপাশি জাগতিক মাধ্যম গ্রহণ করা।

০৬. অতি দ্রুত ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে চেষ্টা করা।

---

[১] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায়: কাফালা, হা. ২২৯১ ও মুসনাদে আহমাদ- হা. ৮৫৮৭।*

সাপ্তাহিক আরাফাত/عرفات أسبوعية
৬৭ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ॥ ১৭ আগস্ট-২০২৬ ঈ.

تَطْوِيْرُ الذَّاتِ / আত্মগঠন

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের জীবনে ইখলাস: একটি বিশ্লেষণ

ড. আহমাদুল্লাহ★

[Summary: Sincerity (Ikhlas) in the Life of Islamic Organization Workers Sincerity, or Ikhlas, means doing every action only for the pleasure of Allah. It is one of the most important qualities for workers of Islamic organizations. All efforts in Dawah, leadership, teaching, social work, and organizational activities become valuable only when they are done withapureintention. The article explains that Islam teaches Muslims to work sincerely without seeking fame, praise, position, or personal benefit. The Qur'an and authentic Hadith clearly show that Allah accepts only those deeds that are done sincerely for Him. Even great deeds can become worthless if the yare done to impress people. Workers of Islamic organizations often face challenges such as pride, desire for leadership, love of popularity and showing off. These things can damage sincerity. Therefore, a believer should regularly check his intention, remember the Hereafter, perform secret good deeds, and seek Allah's help to remain sincere.
The article also highlights that sincere workers bring blessings, unity and success to Islamic movements. True success does not depend only on large numbers or strong organization, but on honest and sincere people who work only for Allah. In conclusion, Ikhlas is the foundation of all Islamic work. Without sincerity, efforts lose their value, but with sincerity, even small actions become greatin the of Allah.]

ভূমিকা: ইসলামী সংগঠন কেবল একটি সাংগঠনিক কাঠামো নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি 'ইবাদতমূলক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার প্রাণ হলো ইখলাস, অর্থাৎ- একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা। কর্মীর 'আমল, ত্যাগ, দাওয়াত, নেতৃত্ব, বক্তব্য, লেখালেখি কিংবা সাংগঠনিক ব্যস্ততা-সবকিছুর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে ইখলাসের ওপর। বর্তমান সময়ে ইসলামী কাজের বিস্তার ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, লোকপ্রিয়তা, পদ-পদবি, প্রশংসা কিংবা দলীয় অহংকার ইখলাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ফলে বাহ্যিক সফলতা থাকলেও আধ্যাত্মিক বরকত ও মহান আল্লাহর সাহায্য কমে যাচ্ছে। তাই ইসলামী সংগঠনের প্রত্যেক কর্মীর জন্য ইখলাসের শিক্ষা জানা, ধারণ করা ও বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী সংগঠনের প্রত্যেক কর্মীদের জীবনে ইখলাস একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনের অংশ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইখলাসের পরিচয়: ইখলাস (الإخلاص) শব্দটি خلص (খা-লা-সা) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ: পবিত্র করা, বিশুদ্ধ করা, খাঁটি করা, একনিষ্ঠ করা, আন্তরিকতা, ভেজালমুক্ত করা, মিশ্রণমুক্ত করা।

পারিভাষিক অর্থ: ইমাম আল-জুরজানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

الإِخْلَاص تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ عَنْ مُلَاحَظَةِالْمَخْلُوقِينَ

"ইখলাস হলো মানুষের দৃষ্টি ও বিবেচনা থেকে 'আমলকে মুক্ত রাখা।"[১] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন:

اَلْإِخْلَاصُ أَنْ يَكُوْنَ الْعَمَلُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ.

"ইখলাস হলো কাজটি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য করা।"[২] ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন:

الإخلاص: التَّنَقِّي عن الشوائب.

"ইখলাস হলো সকল প্রকার মিশ্রণ ও ভেজাল থেকে পবিত্র হওয়া।"[৩]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: ইখলাস হলো– বান্দা তার সকল কাজে মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হবে। সে তার 'ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেবে; মানুষের প্রশংসা বা তাদের কাছে মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্য বানাবে না।[৪]

ইখলাসের গুরুত্ব: সকল 'ইবাদত, 'আমল, কথা ও কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা। ইসলামে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। ইখলাসকে 'আমল কবুল হওয়ার মূল শর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

---

★পিএইচ.ডি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী; সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।

[১] আত-তা'রিফাত- 'আলী ইবনু মুহাম্মদ আল জুরযানী, পৃ. ২৮।
[২] মাদারিজুস সালিকীন- ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১।
[৩] আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন- পৃ. ২৯৪-২৯৫।
[৪] মাজমূ' আল-ফাতাওয়া- ১০ খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

১. ইখলাস আল্লাহর মৌলিক নির্দেশ: আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾

"তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করে।"[১]

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

أي: موحِّدين له العبادة، لايشركون به شيئًا.

অর্থাৎ- "তারা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য 'ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।"[২]

২. ইখলাস ব্যতীত 'আমল গ্রহণযোগ্য নয়: আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا﴾

"যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের 'ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"[৩] ইমাম ফুযাইল ইবনু 'ইয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذاكان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل.

"'আমল হতে হবে ইখলাসপূর্ণ ও সুন্নাহসম্মত; ইখলাস থাকলেও যদি সঠিক না হয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়।"[৪]

৩. নিয়তের ওপর 'আমলের ভিত্তি: রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّمَاالأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"সমস্ত 'আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল; আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে।"[৫]

৪. রিয়ার ভয়াবহতা: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أَخْوَفُ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ.

আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরককে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: "ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, লোকদেখানো 'আমল। কিয়মতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদের দেখানোর জন্য 'আমল করতে, তাদের কাছে যাও এবং দেখো তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কী না।"[৬]

[১] *সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৫।*
[২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৮ম খণ্ড, পৃ, ৪৪৪ (দার তাইয়্যিবাহ সংস্করণ)।*
[৩] *সূরা আল-কাহ্ফ: ১১০।*
[৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া- ৮ম খণ্ড, পৃ, ৯৫।*
[৫] *সহীহ বুখারী- কিতাবু বাদয়িদ ওয়াহী, হা. ০১; সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ইমারাহ, হা. ১৯০৭।*
[৬] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৩৬৩০ ও ২৩৬৩১, হাদীসটি হাসান।*

৫. ইখলাস দ্বীনি কাজের সফলতার মূল ভিত্তি: মহান আল্লাহর সাহায্য সংখ্যার ওপর নয়; বরং ইখলাসের ওপর নির্ভর করে। সাহাবীদের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল তাদের অন্তরের একনিষ্ঠতা। যেমন- বদর যুদ্ধের উদাহরণে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ﴾

"আল্লাহ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।"[৭]

৬. ইখলাস সংগঠনের ঐক্য রক্ষা করে: যখন কর্মীদের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়, তখন-নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব কমে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দূর হয়, পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[৮]

৮. ইখলাস কর্মীদের ত্যাগী বানায়: ইসলামী আন্দোলনের পথে কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। কষ্ট ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সফলতা দান করেন না। ইখলাস না থাকলে কর্মী বিপদের সময় টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ﴾

"তোমরা কি মনে করো? যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো যাচাই করেননি তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রাম করেছে।"[৯]

৯. দাওয়াতি কাজে ইখলাস: দাওয়াতে ইখলাস আবশ্যিক। ইখলাস ব্যতীত দাওয়াতি কাজ বৃথা। দাওয়াত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, দুনিয়াবি কোনো কারণে নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ﴾

"বলুন, এটাই আমার পথ; আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি।"[১০]

১০. আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিকতা নয়, অন্তর দেখেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لَايَنْظُرُإِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُإِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তোমাদের অন্তর ও 'আমলের দিকে তাকান।"[১১]

[৭] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১২৩।*
[৮] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ১০।*
[৯] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৪২।*
[১০] *সূরা ইউসুফ: ১০৮।*
[১১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬৪।*

ইখলাসবিহীন কর্মীদের পরিণতি: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রথম যাদের বিচার হবে তাদের মধ্যে থাকবে– একজন আলেম, একজন শহীদ, একজন দানশীল ব্যক্তি। কিন্তু তারা এসব কাজ করেছিল মানুষের প্রশংসার জন্য। ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১] এ হাদীস ইসলামী সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর জন্য গভীর সতর্কবার্তা।

সালাফে সালেহীনের দৃষ্টিতে ইখলাস: ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ما عا لجت شيئًا أشدَّعليَّ من نيتي.

“আমার নিয়তের চেয়ে কঠিন আর কিছু সংশোধন করতে হয়নি।”[২] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الأعمال بغيرإخلاص كالمسافريملأ جرابه رملًا يثقله ولاينفعه.

“ইখলাসহীন ‘আমল সেই মুসাফিরের মতো, যে তার থলেতে বালি ভরে; তা তাকে ভারী করে কিন্তু কোনো উপকার দেয় না।”[৩] ইমাম ফুদাইল ইবনু ইয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

تَرْكُ الْعَمَلِ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ، وَالْعَمَلُ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ.

“মানুষের কারণে ‘আমল ছেড়ে দেওয়া রিয়া, আর মানুষের জন্য ‘আমল করা শির্ক।”[৪]

ইমাম মাকহুল আদ-দিমাশকী বলেন, “কোনো বান্দা যদি চল্লিশদিন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে ‘আমল করে, তবে তার অন্তর থেকে প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা তার জিহ্বায় প্রকাশ পায়।”[৫]

ইউসুফ ইবনু আল-হুসাইন বলেন, “দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্লভ জিনিস হলো ইখলাস। আমি আমার হৃদয় থেকে রিয়া দূর করতে অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু মনে হয়, তা আবার অন্য রূপে ফিরে আসে।”[৬] **ইখলাস অর্জনের উপায়:**

১. নিয়ত বারবার সংশোধন করা, নিয়মিত আত্মসমালোচনা করা, প্রতিটি কাজের আগে, মাঝে ও পরে নিজেকে প্রশ্ন করা: “আমি কার জন্য কাজ করছি?”

২. গোপনে ‘আমল করা: বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنْ الْإِثْمِ، وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ».

তোমরা রাতের সালাত (কিয়ামুল লাইল) আদায় করো। কেননা এটি তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের অভ্যাস ছিল। এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, পাপ থেকে বিরত রাখে, গুনাহ মোচন করে এবং শরীর থেকে রোগ দূর করে।[৭]

৩. আখিরাতের হিসাব স্মরণ করা: কিয়ামতের ময়দানে মানুষের প্রশংসা কোনো উপকার করবে না। আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ “আখিরাতই উত্তম ও স্থায়ী।”[৮]

৪. রিয়ার ভয় করা: রিয়া ইখলাসকে ধ্বংস করে, ‘আমলকে নষ্ট করে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামও রিয়াকে প্রচণ্ড ভয় করতেন। ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: “রিয়াকারীর তিনটি আলামত– একা থাকলে অলস হয়, মানুষের সামনে সক্রিয় হয়, প্রশংসা পেলে ‘আমল বাড়ায়, নিন্দা পেলে কমায়।”[৯]

৫. মহান আল্লাহর কাছে ইখলাসের দু‘আ করা: রাসূল (ﷺ) দু‘আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ.

“হে আল্লাহ! আমি জেনে শুনে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আশ্রয় চাই।”[১০]

৬. নবীদের দাওয়াতের ভিত্তি ছিল ইখলাস: আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

“বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।”[১১] এ আয়াত একজন দাঈ’ ও সংগঠনের কর্মীর জীবনের মূলনীতি হওয়া উচিত।

৭. লোক দেখানো ‘আমল ধ্বংসের কারণ: আল্লাহ বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ﴾

“ধ্বংস তাদের জন্য যারা সালাত আদায় করে কিন্তু লোক দেখায়।”[১২] রিয়া বা লোক দেখানো ইখলাসের সবচেয়ে বড় শত্রু।

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের জন্য ইখলাস কেন জরুরি?

১. দাওয়াতি কাজকে ‘ইবাদত হিসেবে গণ্য করা: ইসলামী সংগঠনের কাজ কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মসূচি নয়; এটি নবীদের মিশন। তাই এখানে ইখলাস অপরিহার্য।

---

১ সহীহ মুসলিম- হা. ১৯০৫।
২ হিলইয়ায়াতুল আওলিয়া- আবূ নু‘আইম, ৭/৫।
৩ মাদারেজুস সালেহীন- ১/১৮৫।
৪ হিলইয়ায়াতুল আওলিয়া- ৮/৯৫।
৫ হিলইয়ায়াতুল আওলিয়া- আবূ নু‘আইম।
৬ মাদারেজুস সালেহীন- ২/৯১।
৭ তিরমিযী- হা. ৩৫৪৯। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। মা. শা., ৫/৫৫২।
৮ সূরা আল-আ‘লা: ১৭।
৯ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ- ১/৭৯-৮১।
১০ মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৯৬০৬। হাদীস সহীহ।
১১ সূরা আল-আন‘আম: ১৬২।
১২ সূরা আল-মাউন: ৪-৬।

একজন কর্মী সভা, দাওয়াত, প্রশিক্ষণ, লেখালেখি, সামাজিক কাজ বা নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করলে তা 'ইবাদত হয়ে যায় যখন তার উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়।

২. মহান আল্লাহর সাহায্য লাভের মাধ্যম: যে সংগঠনে ইখলাস থাকে, সেখানে মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।"[১]

৩. অল্প 'আমলেও বরকত আসে: ইখলাসপূর্ণ সামান্য কাজও অনেক বড় ফল বয়ে আনে।

৪. বিপদে অবিচল থাকার শক্তি দেয়: যে কর্মী মহান আল্লাহর জন্য কাজ করে, সে প্রশংসা-নিন্দায় ভেঙে পড়ে না; বরং তাকে কঠিন পরিস্থিতিতে স্থিরতা দেয়। সংগঠনের কর্মী অনেক সময় সমালোচনা, অপবাদ, অবমূল্যায়ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ইখলাস তাকে ধৈর্যশীল ও অবিচল রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"আর তুমি সবর করো, তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই।"[২]

৫. নেতৃত্বের লোভ থেকে রক্ষা করে: ইখলাসহীন ব্যক্তি সংগঠনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে নিজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মুখলিস কর্মী নেতৃত্বকে আমানত মনে করেন।

সংগঠনের কর্মীদের ইখলাস নষ্ট হওয়ার কারণ:

১. পদ-পদবির লোভ: নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় নিয়তকে নষ্ট করে।

২. প্রশংসাপ্রিয়তা: মানুষের বাহবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 'আমলকে রিয়ায় পরিণত করে।

৩. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মোহ: কর্মী যখন মহান আল্লাহর চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তখন ইখলাস দুর্বল হয়।

৪. আত্মগর্ব ও দলীয় অহংকার: "আমাদের সংগঠনই শ্রেষ্ঠ –এমন মনোভাব উম্মাহর ঐক্য নষ্ট করে এবং ইখলাস কমিয়ে দেয়।

৫. গোপন 'আমলের অভাব: যে ব্যক্তি কেবল প্রকাশ্য কাজ করে, তার অন্তরে রিয়া প্রবেশের আশঙ্কা বেশি।

[১] *সূরা মুহাম্মাদ: ৭।*
[২] *সূরা আন্-নাহ্ল: ১২৭।*

ইখলাসের ফলাফল: **১.** 'আমল কবুল হয়, **২.** অন্তরে প্রশান্তি আসে, **৩.** দাওয়াতে প্রভাব সৃষ্টি হয়, **৪.** মহান আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয়, **৫.** মৃত্যুর পরও সওয়াব চলমান থাকে।

ইখলাসের প্রতিবন্ধকতা:

১. রিয়া (লোক দেখানো)।

২. খ্যাতির মোহ। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

حب الظهور يقصم الظهور.

"খ্যাতির লোভ মানুষের পিঠ ভেঙে দেয়।"[৩]

৩. পদ-পদবীর আকাঙ্ক্ষা: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ.

"তোমরা নেতৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।"[৪]

৪. প্রশংসা ভালোবাসা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا﴾

"তারা যা করেনি তার জন্য তারা প্রশংসা প্রার্থী।"[৫]

উপসংহার: ইসলামী সংগঠনের শক্তি কেবল জনবল, অর্থ, পরিকল্পনা বা সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে কর্মীদের ইখলাসের মধ্যে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অল্পসংখ্যক মুখলিস মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বিরাট কাজ সম্পন্ন করেছেন। পক্ষান্তরে ইখলাসহীন বিশাল কর্মীবাহিনীও কখনো কখনো কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব ইসলামী সংগঠনের প্রত্যেক কর্মীর উচিত নিয়মিত আত্মসমালোচনা, নিয়ত সংশোধন, রিয়ার ভয় থেকে বাঁচা, গোপন 'আমল বৃদ্ধি এবং সর্বদা এই দু'আ করা–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلَنَا كُلَّهُ صَالِحًا، وَلِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا.

"হে আল্লাহ! আমাদের সমস্ত 'আমলকে সৎকর্ম বানিয়ে দিন, একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি করে দিন এবং তাতে অন্য কারো কোনো অংশ রাখবেন না।" ***(সালাফদের প্রসিদ্ধ দু'আ)***

এটাই একজন ইসলামী সংগঠনের কর্মীর সফলতার মূল চাবিকাঠি এবং আখিরাতের মুক্তির অন্যতম ভিত্তি।

[৩] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৪৮।*
[৫] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৮৮।*

الأحداث الجارية / সাময়িক প্রসঙ্গ

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি কর্তৃক নিয়োগ না দিতে জোর দাবি ঘনিভূত

মোঃ আঃ সাত্তার ইবনে ইমাম*

বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ কমিটির হাতে না দিতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের ঝড়ের আভাস, খোব বাড়ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও। বিরোধীদলের নেতারও প্রতিবাদ শুরু করছে। বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলার ধীরগতির কারণে জনগণের ভিতর অসন্তুষ্টি বাড়ছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার হিসাব অনুযায়ী প্রায় সুয়া লক্ষ শিক্ষক কর্মচারীর পদ ফাঁকা রয়েছে। পূর্বের শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ হত ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে। এতে করে যারা মেধাবী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তারা চাকরি পেতেন না। চলতো ঘুষ বাণিজ্য প্রত্যেকটি পদে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হতো। এনিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অসন্তোষ মারামারি রক্তারক্তি হানাহানি দল বাজি চলত। বহুবছর ধরে শিক্ষক কর্মচারী অভিভাবক এবং সচেতন নাগরিকবৃন্দ দাবি জানিয়ে আসছিলেন মেধাবীদের নিয়োগ করতে হবে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে সরকারীভাবে। বহুবছরের আন্দোলন ও দাবির ফসল ছিল (NTRC) এনটিআরসি এর স্বচ্ছ নিয়োগ। এ নিয়োগের মাধ্যমে গরিব মেধাবীরা ইতিমধ্যে দুই দুইবার নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে কমিটি কর্তৃক দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্তের বিষয়টি বারবার পত্র-পত্রিকা ফেসবুকে উঠে আসছে, অন্যদিকে ১৯ তম সার্কুলার না হওয়ায় বা ধীরগতি হওয়ার কারণে সন্দেহের বিষয়টি আরো ঘনীভূত হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে প্রতীক্ষায় দিন গুনছে কবে সার্কুলার হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে কমিটি কর্তৃক নিয়োগ হবে, এতে করে দেশের মানুষ হতবাক, অভিভাবকেরা হতভম্ব, উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের মাথায় হাত, ইতিমধ্যে প্রতিবাদ ফেসবুকে লেখালেখিতে ছড়িয়ে পড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে, কারণ কমিটি কর্তৃক নিয়োগ হলে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোগ্য অথর্বরা নিয়োগ প্রাপ্ত হবে গরিব মধ্যবিত্তরা টাকার অভাবে মেধাবীরা বঞ্চিত হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের একটি বা দু'টো পদ খালি হলে, ৮-১০ জনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে এ নিয়ে ঝামেলা বাড়বে অসন্তুষ্টি বাড়বে। এতে করে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে ঝগড়াঝাটি, লেখাপড়া বিঘ্নতা, চরমভাবে বেড়ে যাবে খবরদারি করবে কম শিক্ষিত সভাপতি এবং সদস্যরা। অন্যদিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলবাজি চরম আকার ধারণ করবে সরকারি দলের বাহিরে অন্যেরা কোনো অবস্থাতে নিয়োগ প্রাপ্ত হবে না। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদরা বক্তৃতা দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন অন্য দলের লোকেরা চাকরির পরীক্ষা দিতে আসলে হাড় হাড্ডি ভেঙ্গে দিব, তার বক্তৃতা ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় উঠে এসেছে। আরো আসছে নিজের দলের লোক ছাড়া অন্যেরা চাকরির পরীক্ষা দিতে আসলে হাত পা ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করে দিব এতেই প্রমাণ করে ভবিষ্যতে কি হবে, কি হচ্ছে কি হতে পারে। এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত, জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বাহিরে অবস্থান নিলে বা সিদ্বান্ত হলে, ইহাতে সরকার বেকায়দায় পড়বে, বিরোধী দল অন্যেরা আন্দোলন করার ইস্যু খুঁজে বের করবে, সে বিষয়টি অবশ্য সরকারকে মাথায় রাখতে ব্যর্থ হলে তাতে চরম মূল্য দিতে হবে।

পত্রপত্রিকার ভাষ্যমতে এ বিষয়টি নিয়ে যারা যারা ঘাটাঘাটী করছে বা নতুন সিদ্বান্ত নিতে চায় তারা আসলে সরকারের প্রিয় লোক নন। কমিটি কর্তৃক নিয়োগ এটা জনগণ মেনে নিবে না মেনে নিবার মতো সিদ্বান্ত নয়। বিগত ২৪ সালের জুলাই বিপ্লবে বিপ্লবীরা বেসরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসার প্রধান, সহকারী প্রধান, প্রিন্সিপালদের বিতাড়িত করেছিল তাদের সংখ্যা অন্তত তিন হাজার হবে। অভিযোগ ছিল যে, তারা দলবাজী, উৎকোচ, ঘোষ, স্বজনপ্রীতি, লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জোগ সেজেছে, উচ্চতর ডিগ্রিধারী মেধাবী মধ্যবিত্ত পরিবার এবং গরীব পরিবারের, সদস্যদের সরিয়ে পদসমূহ দখল করেছিল। জুলাই বিপ্লবের পর বিতাড়িত হলেও ঐ একই কায়দায় আবার ও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ, অনেকেই আবার পদ ফিরিয়ে নিয়েছে। আবারও কমিটি কর্তৃক নিয়োগ হলে, পূর্বের পন্থা ফিরে আসবে নির্দিধায়।

পত্রপত্রিকা বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আনুমানিকভাবে জানা যাচ্ছেযে বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় এক লক্ষের উপরে পদ শুন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন হলো সার্কুলার দেওয়ার কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত আসছে না, অন্যদিকে প্রধান, সহকারি প্রধানের নিয়োগের বিষয়টিও ঝুলে আছে। সরকারের সুনাম অর্জন করতে হলে, বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনতিবিলম্বে ১৯তম সার্কুলার দিতে হবে এবং পরীক্ষা হয়ে যাওয়া প্রধান, সহকারী প্রধানদের নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। এ সকল বিষয়ে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সচেতন শিক্ষিত সমাজ এবং নাগরিকবৃন্দ এক বিন্দু ছাড় দিতে রাজি হবে না। কারণ ছাড় দিলে বাণিজ্য পরিণত হবে, ব্যবসায় পরিণত হবে। এতে মধ্যবিত্ত, গরিব, মেধাবী, উচ্চ শিক্ষিত সন্তানরা টাকার অভাবে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হবে।

*সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মাদ্রাসা দারুল ইসলাম মুহাম্মদীয়া, বল্লা ফাজিল মাদ্রাসা, কালিহাতী, টাংগাইল।

قصيدة / কবিতা

কখন ফুরাবে পথ

মোল্লা মাজেদ*

এখনও অনেক পথ রয়েছে বাকি।
ক্লান্তির ছোঁয়া পেয়ে মুক্ত বিহঙ্গেরাও ঘুমোয় নিঝুম,
নিশ্চিত মরণ রোধে নেই বাধকতা
অকাতরে সারাক্ষণ ঘুম আর ঘুম।
বিষণ্নের ছায়া ফেলে রক্তিম রং ধরে অনেক আকাশ
চলায় বিরাম টেনে মাঝ পথে থেমে যায়
কন্-কনে এক ঝাঁক চপল বাতাস;
পাড় ভেঙে জেগে ওঠে থুবড়ে থাকা
বিকৃত লাশ আর লাশ।
তবুও এ পথ চলার নেই যেন শেষ,
ক্লান্ত বিহঙ্গ মনে দীপ্ত প্রত্যয়ে
নব রূপে এ চলার উদ্যম অশেষ।
জানে না কোন অভিসারে তমসায় আবরণে
প্রতিক্ষিত সময়ের এই পথ চলা
দুরাশার ক্ষীণতায় মানবীয় বেদনায় তীব্রতর
অব্যক্ত কথাগুলো সংগোপনে বলা।
কখন ফুরাবে পথ
কখন ফুরাবে পথ লক্ষ্যচ্যুত কাফেলার দৃষ্টিতে
এসে যাবে, একান্ত নিভৃতে মাকছুদে মঞ্জিল
আর কোনো স্বপ্ন নয় স্বপ্নীল এ চোখ নয়
বাস্তবতার ছোঁয়া পেয়ে সংগ্রামী চেতনায়
প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলুক সুপ্ত নিখিল।

প্রতিজ্ঞাযোগ্য সংগ্রাম

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

আমি ইমাম আবূ হানীফার মতো
বাতিলের মূর্তিতে আঘাত
করিনি কোনো দ্বীনের বেঘাত,
আমি ইমাম মালেকের হাদীসের দরসের ধ্বনী
কুরআন ও হাদীস দিয়ে দ্বীন মানি,
আমি ইমাম শাফে'য়ীর দ্বীনের মূলনীতির জয়গান
বাতিলের মসনদ ভেঙ্গে করি খানখান,
আমি ইমাম ইবনু হাম্বলের মতো বাতিলের সাথে
আপোষহীনতা
হাদীস বাস্তবায়নে করি না হীনমন্যতা,
আমি ইমাম বুখারীর হাদীসের সংগ্রাম
করবো না কোনো হাদীসের দুর্নাম,
আমি ইমাম মুসলিমের গড়ানো ইতিহাস
করবো না কোনো সুন্নাহর হ্রাস,
আমি ইবনু তাইমিয়ার কারাগারের লেখনী
দ্বীন প্রতিষ্ঠার জাগরণী,
আমি ইবনু তাইমিয়ার লেখা রাসূলের জীবনী
রাসূলের সুন্নাহ গড়বো বিশ্বধরণী,
আমি শাহ ওলিউল্লার দ্বীন-দর্শনের বাণী
আবারো দ্বীন প্রতিষ্ঠা জাগরণের ধ্বনী,
আমি ইবনু ওয়াহাবের তাওহীদী গড়া আন্দোলন
তাওহীদি চেতনায় গড়বো বিশ্ব কানন,
আমি সাইয়্যেদ আহমেদ ব্রেলভীর শহীদী
বালকোটের প্রান্তর
অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মোর অন্তর,
আমি তিতুমীরের গড়া বাঁশের কেল্লা
ভাঙ্গবো সব যুল্মের ওঠা কল্লা।
আমি যুল্মের মসদন করি ছারখার
কুরআন ও সুন্নাহ হবে মোর হাতিয়ার,
আমি মুসলিম জাতির সভ্যতা বিকাশের সাধনা
সত্যদ্বীনের গড়ে ওঠা চেতনা,
আমি মানি না কোনো মানবরচিত বিধান
গড়ে ওঠায় কুরআনী সংবিধান।
তাওহীদ ও সুন্নাহ আন্দোলন মূল গন্তব্য
যে যাই করুক না মন্তব্য।
সংগ্রামের প্রতিবাদ
তাওহীদীবাদ -জিন্দাবাদ।

মুখোশদারী

আব্দুল্লাহ আল নুমান*

মুখোশে তারা দাঁড়ায়, চোখে শুধু ধোঁকা।
বড় বড় কথা বলে, ভেতরটা ফাঁকা।

জ্ঞানের খালি কুয়া, অহংকারে ভরা।
হালাল-হারাম ভুলে, বড় মোল্লার বেশে
মানুষকে ধোকা দিয়ে ফিক করে হাসে।

মুখে ধার্মিকতার ছাপ, হৃদয়ে অগ্নি ধোঁয়া।
কথায় শোভা, কাজে ছল, সত্যের পথে দেয় তারা ছোয়া।

ভয় ভরে হৃদয় কাঁপে, নীরবতা ভারে বাঁধা।
কিন্তু চোখে সত্যের আভা, ধৈর্য আর মহান আল্লাহর আশ্বাস দেখা।

মুখোশ ভাঙবে একদিন, অন্ধকার ফুঁড়ে যাবে আলো।
ছলনার খেলা শেষ হবে, সত্যের জ্বালায় তারা অদৃশ্য ভালো।

অহংকারের কুয়ায় হারাবে, মিথ্যার খেলা হবে শেষ।
মানুষ হবে মুক্তি, সত্যের পথে নিঃশ্বাস বয়বে বেশ।

মুখোশের অন্তরে, আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে যাবে।
চাপাবাজি শেষ হবে, সত্যের সোপানে বিজয় আসবে।

জ্ঞান ও নৈতিকতার শক্তি, অন্ধকার সরাবে ধীরে ধীরে।
মুখোশ ধ্বংস হবে চিরদিন, হক্ব আসবে ধরনীর বুক চিরে।

* বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।
* মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।
* শিক্ষার্থী, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, জোরবাড়ীয়া কোনাপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

পাঁচরুখী এলাকায় জমঈয়তে আহলে হাদীসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্তর্গত পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৪২তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ জুলাই, শনিবার বাদ আসর ছনপাড়া বন্দের বাড়ী জামে মসজিদে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ মাও. মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব শাহাদাত আলী সাগর সহ-সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী। এছাড়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ মাসউদুল আলম উমরী, জামালপুরের কটারবাড়ী দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শাইখ ড. শেখ সাদী বিন আব্দুর রশিদ মাদানী, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী, পাঁচরুখী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব শাইখ মনিরুজ্জামান বিন শফিকুল ইসলাম এবং অত্র মসজিদের ইমাম ও খতিব শাইখ হাফেয বেলাল হোসাইন।

আলোচকগণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলিলের আলোকে ঈমান-‘আক্বীদাহ্, ‘আমল-আখলাক, দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করতে কর্মীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিয়মিত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বক্তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজে বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ ও ‘আমলের প্রচার-প্রসার এবং দাওয়াহ কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক করার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় স্থানীয় মুসল্লি, জমঈয়তে আহলে হাদীসের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

أخبار اشبان / শুব্বান সংবাদ

শুব্বানের কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বারোশতাধিক কর্মীর অংশগ্রহণ, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ‘শাখা ও কর্মী বৃদ্ধি মাস’ ঘোষণা

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বারোশতাধিক কর্মীর অংশগ্রহণে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে দাওয়াহ, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসকে ‘শাখা ও কর্মী বৃদ্ধি মাস’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকাল ৯টায় রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) কাউন্সিল হলে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. আব্দুল্লাহিল হাদীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ গাজী ও যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

উদ্বোধনী পর্বে শুব্বানের শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)-এর কিরাআত বিভাগের পরিচালক হাফেয মাহবুব আলম অর্থসহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। পরে শেকড়ের পরিচালক হাফেয মুহসিন আলম ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন।

স্বাগত বক্তব্যে শুব্বান সভাপতি সম্মেলন আয়োজনের তাওফীক্ব দেওয়ায় আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কর্মী, অতিথি ও জমঈয়তের দায়িত্বশীলদের ধন্যবাদ জানান।

এ সময় তিনি সংগঠনের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখা ব্যক্তিদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। ২০২৪

সালের ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী দেশের কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করে নিহতদের শহীদের মর্যাদা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। পাশাপাশি ফিলিস্তিন, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলিমদের জন্যও দু'আ করেন।

দাওয়াহ কার্যক্রমে অনলাইন সক্রিয়তা বাড়ানোর আহ্বান

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

তিনি শুব্বানের সুশৃঙ্খল আয়োজনের প্রশংসা করে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংগঠনকে আরো গতিশীলভাবে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। বিশেষ করে দাওয়াহ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শুব্বানের সক্রিয়তা বহুগুণ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন শুব্বানের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

বিভিন্ন বিষয়ে দিনব্যাপী আলোচনা

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, দাওয়াহ, সাংগঠনিক ও জীবনঘনিষ্ঠ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও শুব্বানের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং বিশিষ্ট আলেমগণ।

আলোচনায় অংশ নেন তাওহীদী যুব কাফেলা ও শুব্বানের সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হোসাইন, শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী, শাইখ গোলাম কিবরিয়া নূরী, যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ ড. মুজাফফর বিন মুহসিন, শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতিন, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, সহযোগী ফাতাওয়া ও গবেষণা সেক্রেটারি শাইখ আব্দুন নূর বিন আবু সাঈদ মাদানী, শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, নির্বাহী সদস্য শাইখ ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, তা'লীম ও তারবিয়াতবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নুরুল আবসার, সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল ওয়াহীদ মাদানী, সহযোগী দাওয়াহবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, মাদারিসবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ, শুব্বানের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাইখ হাবিবুর রহমান মাদানী, শাইখ ড. শেখ সাদী মাদানী, শাইখ ড. রেজাউল করীম মাদানী, শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালেক ও লুৎফুর রহমান প্রমুখ।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর 'শাখা ও কর্মী বৃদ্ধি মাস'

সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যে শুব্বান সভাপতি আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসকে 'শাখা ও কর্মী বৃদ্ধি মাস' হিসেবে ঘোষণা করেন।

তিনি জেলা দায়িত্বশীলদের নিজ নিজ এলাকায় পরিকল্পিতভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক শাখা প্রতিষ্ঠা ও কর্মী বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

এরপর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের নিরাপদে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়। সমাপনী দোয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন-২০২৬-এর সফল সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দিনব্যাপী এ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ শুব্বানের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন উদ্দীপনা ও গতি সঞ্চার করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): ***আমি একজন যুবক, বয়স ১৭, আমার ঈমান কখনো বাড়ে, কখনো কমে, আমি চাই আমার পরিপূর্ণ ঈমান বাড়ুক। সে জন্য করণীয় কি?***

মুনতাসির হোসেন মহৎ
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

জবাব: **ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ–** ঈমান কিছু কারণে বৃদ্ধি পায়, আর সেসবের বিপরীত কারণে ঈমান হ্রাস পায়। ঈমান বৃদ্ধির দশটি কারণ উল্লেখ করা হলো–

প্রথম কারণ: আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহ (আসমাউল হুসনা) ও তাঁর মহান গুণাবলি (সিফাত)-এর সঠিক জ্ঞান অর্জন। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই প্রকৃত অর্থে তাঁকে ভয় করে।" *(সূরা ফা-ত্বির: ২৮)*

দ্বিতীয় কারণ: শরঈ (দ্বীনি) জ্ঞান অর্জন। এর প্রমাণ ইতিপূর্বে উল্লেখিত সূরা ফা-ত্বির: ২৮ নং আয়াত। এ কারণেই ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "জ্ঞানার্জনের মূল ভিত্তিই হলো আল্লাহভীতি (খাশইয়াত)।"

তৃতীয় কারণ: আল্লাহর সৃষ্টিজগতের (নিদর্শনসমূহের) এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা (তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর) করা। *(সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৯০)*

চতুর্থ কারণ: কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা (তাদাব্বুর) করা। কুরআন তিলাওয়াত ও পাঠের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি সত্যিকার মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন: "আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে।" *(সূরা আল-আনফাল: ২)*

পঞ্চম কারণ: আল্লাহর বেশি বেশি যিক্র করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী: "যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমে যাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" *(সূরা আর্-রা'দ: ২৮)* এছাড়া আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে এবং যে ব্যক্তি যিক্র করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।" *(বুখারী- ৬৪০৭)*

ষষ্ঠ কারণ: নিজের প্রবৃত্তি (নফসের চাহিদা)-এর ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ভালোবাসা ও নির্দেশকে প্রাধান্য দেওয়া। *(বুখারী- ১৭)*

সপ্তম কারণ: যিক্রের মজলিসে উপস্থিত থাকা এবং তাতে অংশগ্রহণে আন্তরিক আগ্রহী হওয়া। *(মুসলিম- ২৭৫০)*

অষ্টম কারণ: গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা। *(মুসলিম- ১৪৪)*

নবম কারণ: বেশি বেশি নফল 'ইবাদত ও নেক 'আমল করা। *(বুখারী- ৬৫০২)*

দশম কারণ: আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমান বৃদ্ধি এবং তা নবায়নের জন্য দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রায়ই এ দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

অর্থ: "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের ওপর অবিচল রাখুন।" *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৪০, সহীহ)*

এছাড়া বান্দার উচিত মহান আল্লাহর কাছে এ দু'আও করা:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

অর্থ: "হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই মহাদানশীল।" *(সূরা আ-লি-'ইমরান: ৮)*

জিজ্ঞাসা (০২): ***বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর কারণে অনেকেই জেনারেল ব্যাংকে টাকা রেখে লেনদেন করে পারসোনাল বা বিসনেস এর কারণে। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ছাড়াও অনেকে সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা রেখেও লেনদেন করে। কিন্তু সেভিংস অ্যাকাউন্টের টাকা সে নিজে খায় না, ফি-সাবিলিল্লাহ দিয়ে দেয়। এতে করে কি সে লেনদেন করতে পারবে, না-কি জেনারেল ব্যাংকে লেনদেন করতে পারবে না অথবা হারাম হবে?***

ফয়েজ আহমেদ খান
সি-৪, ৫৩/এ, সরকার বাড়ি মোড়, ভাসানটেক বাজার, ভাসানটেক, ঢাকা।

জবাব: না, সুদী ব্যাংকে লেনদেন করা হারাম। সুদি (রিবাভিত্তিক) ব্যাংকে চাকরি করা বৈধ নয়। কারণ, তা হয় সুদের কাজে সহযোগিতা করা অথবা সুদকে সমর্থন ও স্বীকৃতি দেওয়ার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো; আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)*

শাইখ আদেল বিন ইউসুফ বলেন, "কোনো ব্যক্তির জন্য তার অর্থ সুদি (রিবাভিত্তিক) ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account)-এ অথবা বিনিয়োগ সনদে (Investment Certificates) জমা রাখা বৈধ নয়।"

(তামামুল মিন্নাহ- ৩/৩৬১)

জিজ্ঞাসা (০৩): ***যদি কোনো বড় বিজনেস প্রতিষ্ঠান সুদের বিজনেস থাকে বা সে তার সাথেও হালাল ব্যবসা পরিচালনা করতে চায় তাহলে সে কি তা পারবে কি-না।***

ফয়েজ আহমেদ খান
সি-৪, ৫৩/এ, সরকার বাড়ি মোড়, ভাসানটেক বাজার, ভাসানটেক, ঢাকা।

জবাব: হ্যাঁ, যদি লেনদেনটি নিজেই হালাল হয় এবং তাতে সুদের কাজে সরাসরি সহযোগিতা না থাকে, তাহলে এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসা করা বৈধ। যেমন- রাসূল (ﷺ) ইয়াহুদীদের লেনদেন করেছেন। তবে যদি আপনার ব্যবসা বা কাজের মাধ্যমে তাদের সুদের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ সহায়তা হয়। যেমন- সুদি ঋণের ব্যবস্থা করা, সুদের হিসাব তৈরি করা, সুদি চুক্তি লিখে দেওয়া, সুদি বিভাগে কাজ করা, তাহলে তা বৈধ নয়। কারণ এটি পাপের কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)*

জিজ্ঞাসা (০৪): ***যদি বিজনেস প্রতিষ্ঠান নিজে শরিয়াহ ব্যাংক দ্বারা পরিচালনা করে কিন্তু তার গ্রাহক জেনারেল ব্যাংক ব্যবহার করে, যেটা স্যালারি অ্যাকাউন্ট হতে পারে। আবার ইসলামী ব্যাংক-এর ওপর আস্থা না থাকার কারণেও জেনারেল ব্যাংক ব্যবহার করে সেই গ্রাহক কি ওই শরিয়াহ ব্যাংক পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথেও লেনদেন করতে পারবে?***

ফয়েজ আহমেদ খান
সি-৪, ৫৩/এ, সরকার বাড়ি মোড়, ভাসানটেক বাজার, ভাসানটেক, ঢাকা।

জবাব: হ্যাঁ, পারবে, যদি লেনদেনটি নিজেই শরিয়াহসম্মত হয়। এখানে দু'টি বিষয় আলাদা। যথা- **১.** গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (সে প্রচলিত/সুদি ব্যাংক ব্যবহার করছে)। **২.** ব্যবসায়িক চুক্তি (পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয়)।

কোনো ব্যক্তি যদি বেতন গ্রহণ, ব্যবসায়িক লেনদেন বা অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবহার করে, তাহলে শুধু সে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবহার করছে এ কারণে তার সঙ্গে বৈধ ব্যবসা হারাম হয়ে যায় না।

কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই কাফিরের সাথে ব্যবসা করেছেন। তবে যদি লেনদেনের মধ্যেই সুদ জড়িত থাকে। যেমন- সুদি ঋণের চুক্তি, সুদভিত্তিক অর্থায়ন, বা সুদের কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা তাহলে তা বৈধ হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৫): ***অনলাইনে শুধু কমিশন ইনকামের সেল্স কাজ করা কি জায়িয? যদি নির্দিষ্ট বেতন কিছু মাস পরে থেকে দেয় তাহলে? আবার, কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো হালাল, যেমন- বাসা রেনোভেশন কোম্পানির কাছে আমাদের মার্কেটিং কোম্পানির এড সার্ভিস বিক্রি করা। কিন্তু সেগুলো এডে হারাম উপকরণ থাকতে পারে যেমন- মিউসিক ও মহিলাদের দেখানো, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টেও একই রকম জিনিস। তবে আমি সেল্স-এর কাজ করায় তা জানব না। তাহলে কি এই সেল্স এর কাজটি হালাল?***

মুহাম্মাদ মাহদিন শাফিন
২ নং কলোনি, মিরপুর-১, ঢাকা।

জবাব: কমিশনভিত্তিক সেলস (সামসারা/দালালি) ইসলামে বৈধ, যদি বিক্রিত পণ্য বা সেবা নিজেই বৈধ হয় এবং কমিশন, কাজ ও শর্ত স্পষ্ট থাকে। ইবনু সীরীন, 'আত্বা, ইব্রাহীম ও হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) দালালির মজুরিতে কোনো দোষ মনে করেননি। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি কেউ বলে যে, তুমি এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এতো এতো এর ওপর যা বেশি হয় তা তোমার, এতে কোনো দোষ নেই। ইবনু সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি কেউ বলে যে, এটা এত এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে, তা তোমার অথবা তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোনো দোষ নেই। নবী (ﷺ) বলেছেন, মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে।

(বুখারী- ২২৭৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

যদি আপনি বাসা রেনোভেশন, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি মূলত বৈধ সেবা বিক্রি করেন, তাহলে মূল কাজটি বৈধ।

তবে যদি আপনি জানেন যে, ওই বিজ্ঞাপন তৈরির উদ্দেশ্য হারাম, অথবা আপনি যে প্রকল্পটি বিক্রি করছেন তাতে মিউজিক, অশ্লীল ছবি বা শরিয়তবিরোধী বিষয় নিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাহলে সে নির্দিষ্ট কাজ বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন: "পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।"

(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)

আপনি যদি সেলস করেন এবং জানেন না পরবর্তীতে তারা কী ধরনের বিজ্ঞাপন বানাবে তাহলে তা বৈধ।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***ব্যভিচারিণী নারীকে জানার পরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে পারিবারিক চাপে পড়ে। এখন সে সালাত ও তাওবাহ্ করে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছে না (তাকে বার বার বলছি, পড়বো পড়বো বলছে, কিন্তু এখনো সালাত শুরু করেনি)। আর এদিকে আমি পুরোপুরিভাবে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভেঙে পড়ছি। তাকে ছাড়তে***

পারছি না ও রাখতে পারছি না (পরিবারের সম্মানের ভয়ে)। এখন আমার করণীয় কি?

এস. কে ইসমাঈল
কলকাতা।

জবাব: আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উদ্দেশ্য–

﴿الزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً...﴾

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করে না...।" *(সূরা আন্-নূর: ৩)*

এর অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণীকেই বিয়ে করতে পারবে কিংবা একজন ব্যভিচারিণী নারী কেবল ব্যভিচারীকেই বিয়ে করতে পারবে; বরং আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো– যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যভিচারী পুরুষ বা নারী আন্তরিকভাবে তাওবাহ্ না করে, ততক্ষণ একজন পবিত্র-চরিত্রবান (আফীফ) মুসলিমের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)'র মত হলো– কোনো পবিত্র-চরিত্রবান পুরুষের সঙ্গে কোনো ব্যভিচারিণী নারীর বিবাহ-চুক্তি বৈধ হবে না, যতক্ষণ না তাকে তাওবাহ্ করতে বলা হয়। যদি সে তাওবাহ্ করে, তাহলে তার সঙ্গে বিবাহ-চুক্তি বৈধ হবে; অন্যথায় বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে, কোনো পবিত্র-চরিত্রবান স্বাধীন নারীর সঙ্গে কোনো ব্যভিচারী পুরুষের বিবাহও বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে আন্তরিকভাবে তাওবাহ্ করে। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"এটি মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"

(তাফসীর ইবনু কাসীর- ৬/৯)

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আয়াতটির অর্থ হলো– যে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এবং তা থেকে তাওবাহ্ করেনি, তার সঙ্গে বিবাহে অগ্রসর হওয়া, যদিও আল্লাহ তা হারাম করেছেন, তাহলে সে দু'টি অবস্থার একটিতে থাকবে। যথা-

প্রথমতঃ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মানে না। এমন ব্যক্তি মুশরিক ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মানে, কিন্তু তার ব্যভিচারের বিষয়টি জেনেও তাকে বিবাহ করেছে। তাহলে এ বিবাহ আসলে ব্যভিচারেরই শামিল, আর বিবাহকারী ব্যক্তি একজন ব্যভিচারী। যদি সে প্রকৃত অর্থে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হতো, তবে সে কখনো এ কাজে অগ্রসর হতো না।

অতএব, এ আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ব্যভিচারিণী নারী তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত তাকে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপভাবে, ব্যভিচারী পুরুষও তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হারাম।" *(তাইসীরুল কারীমির রাহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান- ৫৬১)*

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, ব্যভিচারী তাওবাহ্ না করলে সৎ ব্যক্তির জন্য তাকে বিয়ে করা বৈধ নয়। তাই লজ্জা না করে আপনার উচিত দ্রুত সমাধান করা। হয় সে তাওবাহ্ করে ফিরে আসবে ও সংসার করবে নতুবা বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। আল্লাহ হেফাজত করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (০৭): *আমার এলাকা সিরাজগঞ্জ-এর বেলকুচিতে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ-এ একটি বিলাস বহুল মসজিদ নির্মিত হয়েছে। যে জায়গার ওপর মসজিদটি নির্মিত হয়েছে এটা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। আমরা ৪ ভাই-বোন। যারা সবাই নাবালক থাকা অবস্থাতেই বড় তিনজনের বয়স বাড়িয়ে এবং আমি জীবত থাকা স্বত্বেও আমার অনুমতি ছাড়া ভুয়া দলিল-এর মাধ্যমে তারা জমিটি হাতিয়ে নেয়। ঢাকা ব্যাংক-এর একজন ডিরেক্টর আমান উল্লাহ সরকার ২০২১ সালে সেই জমির ওপর নিজের নামে "আল আমান বাহেলা খাতুন" নামে একটা বিলাস বহুল মসজিদ উদ্বোধন করে। এখন ঠিক এই মসজিদ-এর সামনে আমাদের একটি ব্যবসায়িক মার্কেট আছে, তারা স্বরযন্ত্র করে এখন সেই মার্কেটটি দখল করতে চাচ্ছে। এখন আমি আমার সম্পদ রক্ষা করতে/আমার যে জমি দখল করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এর বিরুদ্ধে কি করতে পারি, যেটা করলে ইসলাম বিরোধী কাজ হবে না?*

আ. রাব্বি আমিন
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জবাব: আপনার থেকে উক্ত জমি জবরদখল করে মসজিদ বানিয়েছে, যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।"

(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৮)

সুতরাং উক্ত জায়গা দখল করতে আপনার যা যা করণীয় তাই করতে পারবেন।

এমনকি জবরদখলকৃত জায়গায় মসজিদ বানিয়ে সেখানে সালাত পড়লে সালাত হবে না, হবে না। এ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

জবরদখলকৃত (গাসবকৃত) জমিতে বা জবরদখলকৃত কাপড় পরে সালাত আদায় করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে হানাফি, মালেকি ও শাফে'য়ী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতে, এ অবস্থায় সালাত আদায় করলে গুনাহ হবে, কিন্তু সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে, হাম্বলি মাযহাবের মতে, এ ধরনের সালাত শুদ্ধ হয় না।

('আল-মাওসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ'- ৩০/১৮৯)

অন্যথায় বলা হয়েছে– "ফকীহগণ একমত যে, জবরদখলকৃত জমিতে সালাত আদায় করা হারাম। কারণ, সালাতের বাইরে সেখানে অবস্থান করাই যখন হারাম,

তখন সালাতের সময় তা আরো অধিক নিষিদ্ধ। এরপর আলেমগণ এ ধরনের স্থানে আদায়কৃত সালাতের শুদ্ধ হওয়া-না হওয়া সম্পর্কে দু’টি মত পেশ করেছেন। যথা-

প্রথম মত (জমহুর: হানাফি, মালেকি ও শাফে‘য়ী): তাদের মতে, সালাত শুদ্ধ হবে। কারণ, নিষেধাজ্ঞাটি সালাতের মূল সত্তার প্রতি নয়; বরং সালাতের বাইরের একটি বিষয়ে (অর্থাৎ- অন্যের জমি দখল করে সেখানে অবস্থান করার প্রতি)।

দ্বিতীয় মত (হাম্বলি মাযহাবের রাজেহ মত): তাদের মতে, গাসবকৃত স্থানে সালাত শুদ্ধ হয় না; এমনকি যদি জমির কেবল একটি অংশও গাসবকৃত হয়। কারণ, এটি এমন একটি ‘ইবাদত যা নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। যেমন ঋতুমতী নারীর সালাত বা সিয়াম শুদ্ধ হয় না, তেমনি এটিও শুদ্ধ হবে না।

তারা বলেন, নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো কাজটি পরিত্যাগ করা এবং তা করলে গুনাহ হওয়া। সুতরাং, যে কাজের মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে, সেই একই কাজের মাধ্যমে কীভাবে সে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জন করবে? মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***সালাতের ভেতর ফরয ও ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?***

জাকারিয়া
মোহাম্মদপুর, মাগুরা।

জবাব: সালাতের রুকন (أركان الصلاة) হলো এমন অপরিহার্য অংশ, যা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে সালাত শুদ্ধ হয় না। অধিকাংশ আলেমের মতে **সালাতের রুকনগুলো** হলো মোট ১৪টি। এগুলো হলো–

১. সামর্থ্য থাকলে ফরয সালাতে দাঁড়িয়ে আদায় করা।

২. তাকবীরে তাহরীমা বলা; অর্থাৎ- প্রথমবার “আল্লাহু আকবার” বলা।

৩. সূরা আল-ফাতিহাহ্ তিলাওয়াত করা।

৪. রুকূ‘ করা। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এমনভাবে ঝুঁকা যাতে দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু স্পর্শ করা যায়।

আর পূর্ণাঙ্গ রুকূ‘ হলো পিঠ সোজা রাখা এবং মাথাকে পিঠের সমান্তরাল রাখা।

৫. রুকূ‘ থেকে উঠে দাঁড়ানো।

৬. সোজাভাবে দাঁড়িয়ে স্থির হওয়া (ই‘তিদাল)।

৭. সিজদাহ্ করা। পূর্ণাঙ্গ সিজদাহ্ হলো কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙুলের অগ্রভাগকে সিজদার স্থানে স্থাপন করা। আর সর্বনিম্ন হলো প্রত্যেক অঙ্গের কিছু অংশ মাটিতে লাগানো।

৮. সিজদাহ্ থেকে উঠা।

৯. দুই সিজদার মাঝখানে বসা। যেকোনোভাবে বসলেই রুকন আদায় হবে। তবে সুন্নাত হলো বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা, ডান পা খাড়া রাখা এবং তা কিবলামুখী করা।

১০. প্রত্যেক কর্মগত রুকনে তুমানীনাহ (স্থিরতা ও প্রশান্তি) বজায় রাখা।

১১. শেষ তাশাহহুদ পড়া।

১২. শেষ তাশাহহুদ ও দুই সালামের জন্য বসা।

১৩. দুই সালাম ফিরানো; অর্থাৎ- দু’বার “আস-সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলা। তবে নফল সালাত ও জানাযার সালাতে একটি সালামই যথেষ্ট।

১৪. রুকনগুলো ধারাবাহিকভাবে (তারতীব অনুযায়ী) আদায় করা। যেমন- কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রুকূ‘র আগে সিজদাহ্ করে, তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর ভুলবশত করলে তাকে ফিরে গিয়ে প্রথমে রুকূ‘, তারপর সিজদাহ্ করতে হবে।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ– ওয়াজিব ছুটে গেলে সাধারণত সাহু সিজদাহ্ দ্বারা পূরণ হয় (যারা ওয়াজিব ও রুকনের মধ্যে পার্থক্য করেন তাদের মতে)। সালাতের ওয়াজিব মোট ৮টি। যথা-

১. তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য সকল তাকবীর বলা।

২. ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তির سمع الله لمن حمده (সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলা।

৩. ربنا ولك الحمد (রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ) বলা।

৪. রুকূ‘তে অন্তত একবার سبحان ربي العظيم (সুবহানা রব্বিয়াল ‘আযীম) বলা।

৫. সিজদায় অন্তত একবার سبحان ربي الأعلى (সুবহানা রব্বিয়াল আ‘লা) বলা।

৬. দুই সিজদার মাঝখানে رب اغفر لي (রব্বিগফির লী) বলা।

৭. প্রথম তাশাহহুদ পড়া।

৮. প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***আমার দু’টি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি প্রতি সপ্তাহে তিনটা ডায়ালিসিস নেই হাসপাতালে। একটা ডায়ালিসিসের খরচ ৩,২০০/-, ডাইলোসিস খরচ ও ওষুধ মিলিয়ে সর্বমোট মাসিক খরচ হয় ৫০,০০০/-। আমি আর্থিকভাবে অসচ্ছল। এখন কি আমি আমার মার ও ভাইদের যাকাতের টাকা নিতে পারব? জানালে উপকৃত হব।***

মোঃ শফিকুল ইসলাম
মধ্য আরিচপুর, টংগী-গাজীপুর।

জবাব: আলেমগণ একমত যে, যার ভরণ-পোষণ (নাফাকা) প্রদান করা যাকাতদাতার ওপর শরিয়ত অনুযায়ী আবশ্যক, তাকে নিজের যাকাত দেওয়া বৈধ নয়।

এক্ষেত্রে এই মায়ের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

যদি শরিয়ত অনুযায়ী তার ছেলের ভরণ-পোষণ বহন করা মায়ের ওপর আবশ্যক হয়, তাহলে তিনি তাকে যাকাত দিতে পারবেন না।

আর যদি শরিয়ত অনুযায়ী তার ভরণ-পোষণ বহন করা মায়ের ওপর আবশ্যক না হয়, তাহলে তাকে যাকাত দিতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং অন্য কাউকে দেওয়ার চেয়ে তাকে যাকাত দেওয়াই উত্তম। তবে মায়ের ওপর সন্তানের ভরণ-পোষণ তখনই আবশ্যক হবে, যখন এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ হবে। মায়ের ওপর সন্তানের ভরণ-পোষণ আবশ্যক হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকতে হবে—

১. সন্তানের পিতা জীবিত না থাকা: যদি পিতা জীবিত থাকেন, তাহলে সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব একমাত্র পিতার ওপরই বর্তায়। ইমাম ইবনু কুদামা (রাহিমাহুল্লাহ) আল-মুগনী গ্রন্থে বলেন: "যদি সন্তানের কোনো পিতা না থাকে, তাহলে মায়ের ওপর সন্তানের ভরণ-পোষণ করা আবশ্যক। এ মতই ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর।"

২. মায়ের আর্থিক সামর্থ্য থাকা: অর্থাৎ- মায়ের কাছে তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে হবে।

৩. সন্তান দরিদ্র ও অর্থের মুখাপেক্ষী হওয়া।

যদি এই তিনটি শর্ত পূরণ হয়, তাহলে মায়ের ওপর সন্তানের ভরণ-পোষণ করা আবশ্যক হবে। সে ক্ষেত্রে তিনি তার সন্তানের কাছে যাকাত দিতে পারবেন না। আর যদি সন্তানের পিতা জীবিত থাকেন, তাহলে মা তার সন্তানের কাছে নিজের যাকাত দিতে পারবেন। কারণ, সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তখন মায়ের ওপর নয়।

হাফিজ ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন: "ইবনুল মুনযিরসহ অন্যান্য আলেম এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন যে, যার ভরণ-পোষণ যাকাতদাতার ওপর আবশ্যক, তাকে ফরয যাকাত দেওয়া যাবে না।"

আর যদি মা তার সন্তানের ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম হন, তাহলে তিনি তার সন্তানকে যাকাত দিতে পারেন; এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এ অবস্থায় সন্তানের ভরণ-পোষণ তার ওপর ওয়াজিব নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ *(পৃ. ১০৪)*-এ বলেন: "যাকাত পিতা-মাতা ও ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের এবং সন্তান-সন্ততি ও অধস্তন বংশধরদেরও দেওয়া বৈধ, যদি তারা দরিদ্র হয় এবং যাকাতদাতা তাদের ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম হয়। এটি ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাবের দু'টি মতের একটি।"

উল্লিখিত আলোচনা অনুযায়ী আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, আপনার জন্য মায়ের যাকাত গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা।

একই কথা ভাইয়ের ক্ষেত্রেও: যদি আপনার ভাই দরিদ্র হয় এবং তার ভরণ-পোষণ শরিয়ত অনুযায়ী আপনার ওপর আবশ্যক না হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে তার ভরণ-পোষণ তখনই আপনার ওপর আবশ্যক হবে, যখন সে মারা গেলে আপনি তার ওয়ারিশ হতেন। আর তা হবে— যদি তার কোনো পিতা, দাদা (পিতার ঊর্ধ্বতন পুরুষ পূর্বপুরুষ) এবং কোনো পুত্রসন্তান না থাকে।

অতএব, যদি এদের কেউ না থাকে, তাহলে তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে আপনি তার উত্তরাধিকারী হবেন। সে অবস্থায়, যদি সে দরিদ্র হয় এবং আপনার নিজের ও আপনার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তাহলে তার ভরণ-পোষণ করা আপনার ওপর আবশ্যক হবে।

জিজ্ঞাসা (১০): ***আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কিছু টাকা ইনভেস্ট করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনি। সেখান থেকে প্রতি মাসে লভ্যাংশ পেত সবাই। যে সবকিছুর দায়িত্বে ছিল রাজনৈতিক কারণে সে এখন পলাতক। সামনের দিকে এই টাকার লাভ এবং মূলধন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় এই টাকার যাকাত আমার ওপর ফরয হবে কি-না?***

'আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
সৌদি আরব।

জবাব: উক্ত টাকার যাকাত ফরয হবে না। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো— সম্পদটি যাকাতদাতার নিয়ন্ত্রণ ও দখলে থাকতে হবে। অর্থ তার নিজের কাছে থাকুক বা অন্য কারো কাছে থাকুক, যখন ইচ্ছা তখন তা আদায় করে নেওয়ার সক্ষমতা থাকতে হবে।

কিন্তু যদি অর্থ কোনো মুদারিব (বিনিয়োগ পরিচালনাকারী)-এর কাছে থাকে এবং সে ব্যবসা, প্রকল্প বা বিভিন্ন বিনিয়োগে ক্ষতিগ্রস্ত বা আর্থিক সংকটে পড়ে, অথবা সে দেউলিয়া হয়, কিংবা টালবাহানা করে এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ না করে এমন অবস্থায় যদি মালিক তার অর্থ ফেরত নিতে সক্ষম না হন, তাহলে ওই সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হবে না, যদিও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। কারণ, এ অবস্থায় তার মালিকানা অসম্পূর্ণ। কার্যত তা এমন সম্পদের মতো, যা তার হাতে নেই। আর এ অবস্থায় তার ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক করা হলে তা মালিকের জন্য স্পষ্ট কষ্ট ও ক্ষতির কারণ হবে। অথচ ইসলামী শরিয়ত যাকাতের ক্ষেত্রে যেমন দরিদ্রের অধিকার সংরক্ষণ করেছে, তেমনি সম্পদশালীর অধিকারও বিবেচনায় রেখেছে।

জিজ্ঞাসা (১১): ***সূরা আল-ইখলা-স ১০ বার পাঠ করলে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয় –এ হাদীসটি সহীহ?***

মোহাম্মদ সজল
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

জবাব: হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ (৩/৪৩৭)-এ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সূরা আল-ইখলা-স 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' দশবার পূর্ণরূপে পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।"

কিন্তু এই সনদটি দুর্বল। কারণ এতে ইবনু লাহী'আহ, রুশদীন ইবনু সা'দ এবং যুবান ইবনু ফায়িদ –এ তিনজনই দুর্বল রাবি। মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৭/১৪৫)-এ বলা হয়েছে– "এর সনদে রুশদীন ইবনু সা'দ ও যুবান উভয়েই দুর্বল; যদিও তাদের সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় প্রশংসাও বর্ণিত হয়েছে।" তবে আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। *(সিলসিলাতুল আহাদীসিস-সহীহাহ্- হা. ৫৮৯)*

'আমল করা যেতে পারে ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (১২): ***জান্নাতে ঘর নির্মাণ হয় যে সকল 'আমল দ্বারা সে 'আমলসমূহ কী কী?***

মোহাম্মদ সজল
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

জবাব: মসজিদ নির্মাণ করা। *(বুখারী- ৪৫০)* সূরা আল-ইখলা-স ১০ বার পাঠ করা। *(সহীহাহ্- হা. ৫৮৯)* সন্তানকে নিয়ে বিপদ বা মুসিবত নেমে এলে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' (ইস্তিরজা) পাঠ করা। *(তিরমিযী- ১০২১, হাসান)* বাজারে প্রবেশের দু'আ পাঠ। *(তিরমিযী- ৩৪২৮, হাসান)* সালাতে কাতারের ফাঁকা স্থান পূরণ করা। *(সহীহাহ্- হা. ১৮৯২)* নিয়মিত ১২ রাকআত সুন্নত আদায়। *(মুসলিম- ৭২৮)* যে ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। *(সহীহ জামে'- ১৪৬৪)* যে ব্যক্তি সত্যের ওপর থাকা সত্ত্বেও তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ করে। *(আবূ দাউদ- ৪৮০০, সহীহ)* যে ব্যক্তি রসিকতা করার জন্যও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকে। *(আবূ দাউদ- ৪৮০০, সহীহ)* উত্তম চরিত্র। *(আবূ দাউদ- ৪৮০০, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (১৩): ***আমার নিকটতম এক আত্মীয় তার নিজ প্রয়োজনে আমার কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। তার সাথে আমার চুক্তি হয়েছিল এই মর্মে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকাগুলো আমাকে ফেরত দেবে। সে ওয়াদা রাখতে সক্ষম হয়নি, কয়েকবার নাসিহা করি। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তার সাথে আমার খারাপ আচরণ হয়ে যায়। এখন আমি অনুতপ্ত পূর্বের আচরণের জন্য। আমি যে পাপগুলো করে ফেলেছি এর থেকে মুক্ত হব কি করে? দয়া করে জানাবেন।***

মোহাম্মদ সজল
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

জবাব: তার সাথে আপনার যে আচরণ হয়েছে এটাতে আপনার পাপ হবে না ইন্ শা-আল্লাহ যদি সে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করে থাকে।

নবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা তার মানহানি ও শাস্তি বৈধ করে দেয়। সুফ্ইয়ান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার মানহানি অর্থ- পাওনাদারের এ কথা বলা যে, তুমি আমার সঙ্গে টালবাহানা করছ আর তার শাস্তির অর্থ হচ্ছে বন্দী করা। *(বুখারী- ২৪০১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)*

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর কাছে এক লোক (ঋণ পরিশোধের) তাগাদা দিতে আসল এবং কড়া কথা বললো। সাহাবীগণ তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে নবী (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হক্বদারের (কড়া) কথা বলার অধিকার আছে। *(বুখারী- ২৪০১)* তবে যদি অক্ষম হয় তাহলে তাকে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া আবশ্যক। *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৮০)* এ অবস্থায় আপনার আচরণের কারণে তার কাছে মাফ চাইবেন বা তার জন্য বেশি বেশি দু'আ করবেন। ইন্ শা-আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মাফ করে দিবেন।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***বিত্‌র সালাতে দু'আয় কুনূত পড়া আবশ্যক? আর তিন রাকআত বিত্‌র পড়লে কি ইচ্ছে মতো কিরআত পড়া যাবে কি? নাকী ৩ রাকআতের জন্য আলাদা আলাদা সূরা পড়তে হবে? বিস্তারিত জানাবেন।***

মোত্তালিব আকন্দ
মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

জবাব: বিত্‌র সালাতে কুনুত পড়া আবশ্যক নয়। বিত্‌রের সালাতে কুনুত পড়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা-তে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেছেন: "আর বিত্‌রের কুনুতের ব্যাপারে আলেমদের তিনটি মত রয়েছে। যথা-

প্রথম মত: বিত্‌রে কোনো অবস্থাতেই কুনুত পড়া মুস্তাহাব নয়। কারণ নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত নয় যে, তিনি বিত্‌রের সালাতে কুনুত পড়েছেন।

দ্বিতীয় মত: বরং সারা বছরই বিত্‌রের কুনুত পড়া মুস্তাহাব। যেমন- ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ থেকে এমন মত বর্ণিত হয়েছে। কারণ হাদীসের কিতাবগুলোতে এসেছে যে, নবী (ﷺ) হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিত্‌রের কুনুতের দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

তৃতীয় মত: বরং রমাযানের শেষ অর্ধেকে কুনুত পড়া উচিত। যেমন- উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) করতেন।

বাস্তব কথা হলো– বিত্‌রের কুনুত হলো সালাতের মধ্যে বৈধ দু'আর অন্তর্ভুক্ত। যে চাইবে তা পড়বে, আর যে

চাইবে তা ছেড়ে দেবে। যেমন- কেউ তিন, পাঁচ বা সাত রাকআত বিত্‌র পড়তে পারে। আবার তিন রাকআত পড়লে চাইলে আলাদা আলাদা পড়তে পারে, চাইলে একসঙ্গে পড়তে পারে। অনুরূপভাবে কুনুতের দু'আর ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা রয়েছে, চাইলে পড়বে, চাইলে ছেড়ে দেবে। আর যদি কেউ রমাযানের তারাবির (কিয়ামের) সালাতে পুরো মাস কুনুত পড়ে, তবুও সে ভালো করেছে। যদি শেষ অর্ধেকে পড়ে, তবুও ভালো করেছে। আর যদি কখনোই না পড়ে, তবুও সে ভালো করেছে।" ***(আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা- ২/১১৯)***

সুতরাং বিত্‌রের কুনুতের দু'আ পড়া বা না পড়ার মধ্যে স্বাধীনতা আছে।

অনুরূপভাবে ৩ রাকআতে ইচ্ছে মত কিরআত পড়াও সুযোগ আছে। তবে সুন্নাহ হচ্ছে, প্রথম রাকআতে সূরা আল-'আলা-, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-কা-ফিরুন, তৃতীয় রাকআতে সূরা আল-ইখলা-স পড়া। ***(তিরমিযী- ৪৬২, সহীহ)***

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমি একজন মহিলা। আমার ৩টা বাচ্চা আছে, সবগুলো সিজার অপারেশনে হয়েছে। এখন আবার আমার প্রেগন্যান্সি হওয়ার সম্ভাবনা/হয়েছে। আমার শরীর অনেক দুর্বল, আর ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে কেউ ঠিকমতো সাহায্য করছে না, তাই আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। এই অবস্থায় ইসলাম অনুযায়ী আমার জন্য কী করা ঠিক হবে জানতে চাই। যদি গর্ভপাত করি, তাহলে সেটা কি জায়িয হবে?***

ফেনসি আক্তার
এয়ারপোর্ট, ঢাকা।

জবাব: ইসলাম অনুযায়ী, সাময়িক গর্ভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তবে যদি বিশ্বস্ত মুসলিম ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত দেয় যে, আর সিজার করা যাবে না বা সিজার করলে মায়ের জীবনের ঝুঁকি আছে তাহলে স্থায়ীভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ আছে। ***(সূরা আল-বাক্বারাহ্‌: ১৯৫)***

যদি এরূপ কোনো সমস্যা না হয় শুধুমাত্র শারীরিক দুর্বলতা আর গর্ভধারণ করেছেন ও গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স ১২০ দিন হয় তাহলে সন্তান নষ্ট করা হারাম হবে।

সিনিয়র আলেম পরিষদ (মাজলিসু হাইআতিল কিবারিল উলামা) নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে–

১. শরয়ি গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া এবং অত্যন্ত সীমিত ব্যতিক্রমী অবস্থা ব্যতীত গর্ভাবস্থার কোনো পর্যায়েই গর্ভপাত করা বৈধ নয়।

২. যদি গর্ভাবস্থা প্রথম পর্যায়ে থাকে (অর্থাৎ- প্রথম ৪০ দিনের মধ্যে) এবং গর্ভপাতে কোনো শরয়ি কল্যাণ (মাসলাহা) অর্জিত হয় অথবা কোনো ক্ষতি দূর হয়, তাহলে গর্ভপাত করা বৈধ। কিন্তু এই সময়ে শুধু সন্তান লালন-পালনের কষ্টের আশঙ্কায়, তাদের ভরণ-পোষণ বা শিক্ষার ব্যয় বহন করতে না পারার ভয়ে, ভবিষ্যতের চিন্তায়, অথবা স্বামী-স্ত্রীর ইতোমধ্যে সন্তান রয়েছে এই কারণগুলো দেখিয়ে গর্ভপাত করা বৈধ নয়।

৩. যদি গর্ভাবস্থা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে থাকে (অর্থাৎ- দ্বিতীয় ও তৃতীয় ৪০ দিন মোট ৪০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে), তাহলে গর্ভপাত করা বৈধ নয়। তবে যদি একটি বিশ্বস্ত চিকিৎসক বোর্ড নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত দেয় যে, গর্ভধারণ অব্যাহত থাকলে মায়ের জীবনের জন্য গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে এবং তার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, আর সেই ঝুঁকি দূর করার সব ধরনের উপায় গ্রহণ করার পরও অন্য কোনো সমাধান না থাকে, তাহলে গর্ভপাত করা বৈধ হবে।

৪. তৃতীয় পর্যায় অতিক্রম করে চার মাস (১২০ দিন) পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভপাত করা মোটেই বৈধ নয়। তবে যদি বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত দেয় যে, গর্ভে সন্তান থাকলে মায়ের মৃত্যু ঘটবে এবং মায়ের জীবন রক্ষার জন্য সব ধরনের উপায় গ্রহণ করার পরও অন্য কোনো বিকল্প নেই, তাহলে সে ক্ষেত্রে গর্ভপাতের অনুমতি রয়েছে।

এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে দু'টি ক্ষতির মধ্যে বড় ক্ষতিকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং দু'টি কল্যাণের মধ্যে বৃহত্তর কল্যাণ অর্জনের নীতির ভিত্তিতে। ***(ইসলামী সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ৪২৩২১)***

জিজ্ঞাসা (১৬): ***বর্তমান পৃথিবীতে শিয়াদের মধ্যে কতগুলো দল বা উপদল রয়েছে এবং সবাইকে কি এক বাক্যে কাফির বলা যাবে?***

আব্দুল আলিম বিন সাইফুল
কদমডাঙ্গা ইসলামিয়া আরাবিয়া স্যালাফিয়া মাদ্‌রাসা,
সাপাহার, নওগাঁ।

জবাব: বর্তমানে শিয়াদের অনেক দল ও উপদল বিদ্যমান আছে এবং তাদের সবাইকে একবাক্যে কাফির বলা যাবে না। শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"শিয়ারা বহু দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে এমন দলও আছে যারা কাফির। তারা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র 'ইবাদত করে, 'হে 'আলী!' বলে তাকে আহ্বান করে এবং ফাতিমাহ্‌, হুসাইন প্রমুখের 'ইবাদত করে। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমানতে খিয়ানত করেছেন; নবুওয়াত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নয়; বরং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কাছে আসার কথা ছিল। তাদের মধ্যে আরেকটি দল হলো ইমামিয়া (ইসনা আশারিয়া/বারো ইমামপন্থী রাফেযী)। তারা 'আলীর ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়ি করে

এবং বলে যে, তাদের ইমামরা ফেরেশ্‌তা ও নবীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

শিয়াদের আরো অনেক উপদল রয়েছে। তাদের মধ্যে কাফিরও আছে, আবার কাফির নয় এমনও আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা অবস্থানের লোক হলো সে, যে বলে– 'আলী আবূ বক্‌র, 'উমার ও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর চেয়ে উত্তম। এমন ব্যক্তি কাফির নয়; তবে সে ভুলকারী। কারণ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চতুর্থ খলিফা, আর আবূ বক্‌র সিদ্দীক, 'উমার ও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর চেয়ে উত্তম। যে 'আলীকে ঐ তিনজনের ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে সাহাবিদের ঐকমত্যের বিরোধিতা করেছে; তবে সে কাফির হয়ে যায় না। শিয়ারা বিভিন্ন স্তর ও দলে বিভক্ত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ইমামদের গ্রন্থাবলি দেখতে হবে। যেমন- 'আল-খুতূতুল আরীদাহ' (মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব), মিনহাজুস সুন্নাহ এবং 'আশ-শীআহ ওয়াস-সুন্নাহ' (ইহসান ইলাহী যহীর) প্রভৃতি গ্রন্থ। এসব বইয়ে তাদের ভুল ও ভ্রান্তি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দল হলো ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া এবং নুসাইরিয়া; এদেরকে রাফেযীও বলা হয়। কারণ তারা জায়েদ বিন 'আলীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যখন তিনি আবূ বক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

যে-ই ইসলাম দাবি করুক না কেন, শুধু দাবির কারণে তাকে মুসলিম বলে মেনে নেওয়া যাবে না। তার দাবিকে যাচাই করতে হবে। যে ব্যক্তি একমাত্র মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে, তাঁর রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করে সেই প্রকৃত মুসলিম।

কিন্তু কেউ যদি ইসলাম দাবি করে, অথচ ফাতিমাহ্, বদভী, আইদরূস বা অন্যদের 'ইবাদত করে, তাহলে সে মুসলিম নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিরাপদ রাখুন।

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি দ্বীনকে গালি দেয় অথবা সালাত ত্যাগ করে যদিও সে নিজেকে মুসলিম বলে সে মুসলিম থাকে না। একইভাবে, যে ব্যক্তি দ্বীন, সালাত, যাকাত, সিয়াম বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নিয়ে বিদ্রূপ করে, অথবা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে কিংবা বলে তিনি অজ্ঞ ছিলেন অথবা তিনি মহান আল্লাহর বার্তা পূর্ণভাবে পৌঁছে দেননি –এরা সবাই কুফ্‌রি করেছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।" *(মাজমূ' ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনু বায"- খণ্ড ২৮, পৃ. ২৫৭)*

জিজ্ঞাসা (১৭): ***কোনো মুসলিম যদি তার বন্ধুদের সামনে বলে, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবিশ্বাস মূলক কথা বলে, কিন্তু কিছু দিন পরে তাওবাহ্ করে, তবে কি আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন, না-কি বন্ধুদের সামনে অবিশ্বাস প্রকাশ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না?***

তাফহিমা
বগুড়া।

জবাব: তাওবার মাধ্যমে সকল পাপ মোচন হয়। তাই তাওবার শর্ত পূরণ করে আপনার বন্ধু তাওবাহ্ করলে ইন্‌শা-আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। তাওবাহ্ কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে– **১.** পাপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। **২.** পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। **৩.** ঐ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে।

সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তাওবাহ্ বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ... মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" *(সূরা আয্-যুমার: ৫৩)*

জিজ্ঞাসা (১৮): ***Facebook id তৈরি করে বিক্রি করি, এই কাজ করে উপার্জন করা কী হালাল হবে?***

নেহা মনি
কুমিল্লা।

জবাব: যদি নিজের বা প্রকৃত ব্যক্তির তথ্য দিয়ে বৈধভাবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন, Facebook-এর নিয়ম ভঙ্গ না করেন, ক্রেতাকে প্রতারণা না করেন এবং অ্যাকাউন্টটি কোনো হারাম কাজে ব্যবহারের জন্য বিক্রি না করেন, তাহলে এটি একটি ডিজিটাল সম্পদ বা সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে। তবে যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিপরীত হয় তাহলে বৈধ হবে না। *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৭৫; মুসলিম- ১০১)*

জিজ্ঞাসা (১৯): ***আমার স্ত্রীর বর্তমানে মাসিক চলছে। সে যদি সহবাস ব্যতিত তার হাত বা শরিরের অন্য অংশ দিয়ে আমার বীর্য বের করে, তাহলে কি গুনাহ হবে? আমাকে জানাবেন।***

মো. রেদোয়ান হোসেন
শিবচর, মাদারীপুর।

জবাব: না, পাপ হবে না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের থেকে যেকোনোভাবে যৌনসুখ গ্রহণ করতে পারে, যতক্ষণ তারা হায়েয অবস্থায় যোনিপথে সহবাস এবং পায়ুপথে সহবাস থেকে বিরত থাকে। তাই স্ত্রী স্বামীর হাত দিয়ে বা স্বামী

স্ত্রীর হাত দিয়ে বীর্যপাত ঘটালে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এর দলিল মহান আল্লাহর বাণী:

“আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তবে তাদের স্ত্রী অথবা তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে নয়; কেননা এতে তারা নিন্দিত নয়।” *(সূরা আল-মু’মিনূন: ৫-৬)*

জিজ্ঞাসা (২০): ***মসজিদের স্তম্ভ (খুঁটি)-এর মাঝখানে কাতার করার বিধান কি?***

আব্দুল্লাহ
ময়মনসিংহ।

জবাব: মসজিদের স্তম্ভ (খুঁটি) এর মাঝখানে কাতার করা থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, কারণ এতে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইবনু মাজাহ্ (১০০২) বর্ণনা করেছেন, মু‘আবিয়াহ্ ইবনু কুররাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমাদের স্তম্ভগুলোর মাঝখানে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করা হতো; বরং সেখান থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হতো।” *(সহীহ)*

তিরমিযী (২২৯) এ ‘আব্দুল হামীদ ইবনু মাহমূদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: “আমরা এক আমীরের পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় আমরা বাধ্য হয়ে দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়ালাম। সালাত শেষে আনাস বিন মালিক বললেন: ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমরা এভাবে দাঁড়ানো এড়িয়ে চলতাম।’”

এ হাদীসকেও শায়খ আল-আলবানী সহীহ তিরমিযী-তে সহীহ বলেছেন।

ইবনুল মুফলিহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “মুক্তাদির জন্য স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়ানো মাকরূহ।” ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: “কারণ এতে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।” *(আল-ফুরু‘- ২/৩৯)*

তবে যদি প্রয়োজন থাকে, যেমন- মুসল্লির সংখ্যা বেশি হওয়া বা মসজিদ সংকীর্ণ হওয়া, তাহলে স্তম্ভের মাঝখানে কাতার করলে কোনো অসুবিধা নেই।

ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দায়েমাহ-এর আলেমগণ বলেছেন: “স্তম্ভ যদি কাতার বিচ্ছিন্ন করে, তাহলে তার মাঝখানে দাঁড়ানো মাকরূহ। তবে মসজিদ সংকীর্ণ হওয়া এবং মুসল্লির সংখ্যা বেশি হলে এ মাকরূহ থাকে না।” *(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ৫/২৯৫)*

ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “মসজিদ সংকীর্ণ হলে স্তম্ভের মাঝখানে কাতার করা বৈধ। কিছু আলেম এ বিষয়ে ইজমা‘ও উল্লেখ করেছেন। আর জায়গা প্রশস্ত হলে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো– এটি নিষিদ্ধ; কারণ এতে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়, বিশেষ করে স্তম্ভ যদি প্রশস্ত হয়।”

জিজ্ঞাসা (২১): ***বাবার ওপর যে ভরণ-পোষণ ওয়াজিব, তা আদায়ের জন্য তাঁর অজান্তে তাঁর কিছু সম্পদ বিক্রি করা কি বৈধ?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব: প্রথমতঃ সন্তানের ভরণ-পোষণ বাবার ওপর ওয়াজিব, বাবার ওপর তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব। ছেলেদের ক্ষেত্রে, তারা উপার্জনে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত। মেয়েদের ক্ষেত্রে, তাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত।

দ্বিতীয়তঃ বাবা যদি ওয়াজিব নাফাকা দিতে অস্বীকার করেন বা কম দেন, তাহলে তাঁর সম্পদ থেকে নেওয়ার বিধান, যদি সামর্থ্যবান বাবা সন্তানের জন্য ওয়াজিব ভরণ-পোষণ দিতে অবহেলা করেন বা তা দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে মা অথবা যেসব সন্তানের নাফাকার অধিকার রয়েছে, তারা বাবার অজান্তে তাঁর সম্পদ থেকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী (প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী) নিতে পারবে।

হিন্দা বিনতু ‘উত্বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তিনি আমাকে ও আমার সন্তানকে যথেষ্ট খরচ দেন না। তাই আমি তাঁর অজান্তে তাঁর সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে নিই।” তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: “তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু গ্রহণ করো।” *(বুখারী- ৫০৪৯)*

ইবনু কুদামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “যদি স্বামী স্ত্রীর প্রাপ্য ভরণ-পোষণের সবটুকু বা কিছু অংশ না দেয়, আর স্ত্রী তার সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, তাহলে সে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নিজের প্রয়োজন পরিমাণ নিতে পারবে। কারণ নবী (ﷺ) হিন্দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছিলেন: ‘তুমি তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করো’।” *(আল-মুগনী- ১১/৩৫৭)*

উল্লেখ্য যে, এই বিধান হলো শুধু নিজের ন্যায্য ও ওয়াজিব প্রাপ্য নাফাকা আদায়ের ক্ষেত্রে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেওয়া বা অন্যায়ভাবে বাবার সম্পদ ভোগ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২২): ***যে ব্যক্তি মূত্রনালিতে ক্যাথেটার (Urinary Catheter) ব্যবহার করেন, তিনি কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করবেন এবং সালাত আদায় করবেন?***

ইউসুফ আলী
বাগেরহাট।

জবাব: **প্রথমতঃ ক্যাথেটার কী?** ক্যাথেটার (القسطرة) হলো একটি প্লাস্টিকের নল, যা রোগীর মূত্রনালি বা পেটে স্থাপন করা হয়, যাতে অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিক পথের পরিবর্তে মূত্র বা পায়খানা বের করা যায়। এ অবস্থায় রোগীর ইচ্ছা বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মূত্র বা পায়খানা বের হয় এবং একটি বিশেষ ব্যাগে জমা হয়, যা রোগীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। অনেক সময় এ প্রবাহ প্রায় অবিরাম চলতে থাকে। ক্যাথেটার দুই ধরনের। যথা-

১. সাধারণ (স্থানীয়) ক্যাথেটার: এতে মূত্রনালি বা পায়ুপথ দিয়ে নল প্রবেশ করিয়ে মূত্রথলি বা বৃহদান্ত্র খালি করা হয়। এটি নির্দিষ্ট সময় পরপর করা হয়। এ ক্ষেত্রে মূত্র বা পায়খানা স্বাভাবিক পথ দিয়েই বের হয়। তাই ওযূ ভেঙে যায় এবং সাধারণ মূত্র-পায়খানার সব বিধানই প্রযোজ্য হবে।

২. পার্শ্বীয় (Side) ক্যাথেটার: এতে পেটে একটি ছিদ্র করে সেখান দিয়ে মূত্র বা পায়খানা বের করা হয়। অর্থাৎ- নাপাকি স্বাভাবিক পথ দিয়ে নয়; বরং নাভির নিচে বা ওপরে তৈরি করা একটি ছিদ্র দিয়ে বের হয়।

এ অবস্থায় ওযূর বিধান: জমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মতে, পার্শ্বীয় ক্যাথেটার দিয়ে মূত্র বা পায়খানা বের হলেও ওযূ ভেঙে যায়। এ কারণে এ ব্যক্তির বিধান স্থায়ী ওযূ-ভঙ্গের ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির মতো হবে। অর্থাৎ- প্রত্যেক ফরয সালাতের সময় শুরু হওয়ার পর নতুন করে ওযূ করবে। সেই ওযূ দিয়ে ফরয ও নফল যত ইচ্ছা সালাত আদায় করতে পারবে। ওই সালাতের সময়ের মধ্যে ক্যাথেটার দিয়ে মূত্র বা পায়খানা বের হতে থাকলেও তা তার সালাতের ক্ষতি করবে না।

নাপাকি-ভর্তি ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে সালাত: যদি ক্যাথেটারের ব্যাগ বদলানো বা খালি করা রোগীর জন্য সহজ হয়, তাহলে সালাতের আগে তা খালি বা পরিবর্তন করা উত্তম। কিন্তু যদি এতে কষ্ট হয়, তাহলে সে তার বর্তমান অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।" ***(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৮৬)***

আরো বলেন: "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।" ***(সূরা আত্-তাগা-বূন: ১৬)***

জিজ্ঞাসা (২৩): ***মামা কি তার বোনের মেয়েদের (ভাগ্নিদের) পর্দাহীনতা বা সাজসজ্জা প্রদর্শনের জন্য জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন?***

নোমান
কুমিল্লা।

জবাব: যতক্ষণ ভাগ্নিদের বাবা জীবিত, সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন, শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) এবং উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ মামার ওপর তাদের অভিভাবকত্ব (ولاية) থাকে না।

এটি সুস্পষ্ট যে, সন্তানদের লালন-পালন ও দেখাশোনা তাদের পিতার ওপরই ওয়াজিব, যতদিন তিনি জীবিত থাকেন। তাই তাদের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনের ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে তিনিই জবাবদিহি করবেন। ***(বুখারী- ২৫৫৪)***

তবে মামার ওপর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং যদি তিনি তার বোনের সন্তানদের কোনো গুনাহ বা শরিয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত দেখতে পান, তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের তা থেকে নিষেধ করা তাঁর জন্য ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় (মুনকার) দেখবে, সে যেন তা তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জিহ্বা (কথা) দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তরে তা ঘৃণা করবে। আর এটিই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" ***(মুসলিম- ৪৯)***

জিজ্ঞাসা (২৪): ***শিশুদের জন্য কার্টুন (অ্যানিমেশন) পর্ব/এপিসোড তৈরি করার শরয়ী বিধান।***

সাঈদ
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: **প্রথমতঃ** মূলনীতি হলো– প্রাণীযুক্ত (জীবন্ত সত্তার) ছবি আঁকা বা প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম। তা ভাস্কর্য হোক, কাগজে হোক, কাপড়ে হোক বা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক এবং তা বাস্তব কোনো প্রাণীর ছবি হোক বা কল্পিত উভয় ক্ষেত্রেই একই বিধান। কারণ এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। যেমন- নবী (ﷺ) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে ছবি নির্মাতারা।" ***(বুখারী- ৫৯৫০; মুসলিম- ২১০৯)***

তবে এর একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হলো শিশুদের খেলনার জন্য ব্যবহৃত ছবি বা প্রতিকৃতি।

এর প্রমাণ, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক অথবা খাইবারের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। আমার ঘরের তাকের সামনে একটি পর্দা ঝুলানো ছিল। বাতাসে পর্দার এক পাশ সরে গেলে আমার খেলনা পুতুলগুলো দেখা গেল। তিনি বললেন, 'হে 'আয়িশাহ্! এগুলো কী?' আমি বললাম, 'এগুলো আমার পুতুল।' তিনি তাদের মাঝখানে কাপড়ের টুকরো দিয়ে

তৈরি দু'টি ডানাওয়ালা একটি ঘোড়া দেখতে পেয়ে বললেন, 'এটি কী, যা আমি তাদের মাঝখানে দেখছি?' আমি বললাম, 'এটি একটি ঘোড়া।' তিনি বললেন, 'এর ওপর এগুলো কী?' আমি বললাম, 'দু'টি ডানা।' তিনি বললেন, 'ঘোড়ার আবার ডানা হয় না-কি!' আমি বললাম, 'আপনি কি শোনেননি যে, সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)-এর এমন ঘোড়া ছিল, যাদের ডানা ছিল?'"

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এত হাসলেন যে, আমি তাঁর চোয়ালের শেষ দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।" ***(আবূ দাঊদ- ৪৯৩২, সহীহ)***

হাফিয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারী (১০/৫২৭)-এ বলেন: এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেয়েশিশুদের খেলাধুলার জন্য পুতুল ও অনুরূপ খেলনা রাখা বৈধ। এটি ছবি রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ বিধান থেকে একটি ব্যতিক্রম। এ থেকে আরো বোঝা যায় যে, শিশুরা নিজেরাই এসব খেলনা বা ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি (মুজাসসামা) তৈরি করতে পারে, অথবা তাদের জন্য অন্যরাও তা তৈরি করে দিতে পারে।

সুতরাং শিশুদের জন্য কার্টুন চলচ্চিত্র বা অ্যানিমেশন তৈরি করাতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি তা হারাম বিষয় যেমন- সঙ্গীত ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকে। কারণ শিশুদের জন্য ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরীয়তে বিশেষ অনুমতি (রুখসত) এসেছে। তাছাড়া, শরীয়তের সীমারেখা মেনে তৈরি এমন কার্টুন বিদ্যমান থাকলে তা অনিষ্ট কমাতে সহায়ক হয় এবং শিশুদের উপকারী বা অন্তত বৈধ কাজে ব্যস্ত রাখে।

এছাড়াও সিংহের চরিত্রকে শিশুর আকৃতিতে নকশা করা এবং তার জন্য চোখ ও নাক আঁকাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

জিজ্ঞাসা (২৫): ***জুমু'আর দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতেও কি আমাদের দরূদ (নবী [ﷺ]-এর প্রতি সালাত ও সালাম) তাঁর কাছে পেশ করা হয়?***

আব্দুল্লাহ আল মামুন
গাজীপুর।

জবাব: নবী (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের দরূদ ও সালাম কেবল জুমু'আর দিনই নয়; বরং সব সময়ই তাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণ রয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর এমন কিছু ফেরেশ্তা আছেন, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করেন এবং আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছে দেন।" ***(নাসায়ী- ১২৮২, সহীহ)***

জিজ্ঞাসা (২৬): ***বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ﷺ) উম্মতের জন্য কয়টি জিনিস রেখে যাওয়ার কথা বলে গেছেন? বি. দ্র. সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ এবং তিরমিযীর হাদীসে ১টি অর্থাৎ- কুরআনের কথা বলা আছে। কিন্তু বুখারীসহ অন্যান্য অনেক কিতাবে সহীহ সূত্রে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমাকে শুধু কুরআন নয়; বরং কুরআনের অনুরূপ আরো একটি জিনিস (অর্থাৎ- সুন্নাহ বা হাদীস) দেওয়া হয়েছে। আমার মূল প্রশ্ন– বিদায় হজ্জে যেহেতু ১টির কথা আসছে সেখানে ১টি বললে এবং যেখানে ২টির কথা আসছে সেখানে দু'টির কথা বললে সমস্যা কি? ১টির কথা কেউ বলে না কেন?***

বায়োজিদ বোস্তামি
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

জবাব: আপনি সঠিক বলেছেন। হাদীস বর্ণনার এটাই নিয়ম। তবে ১টির কথা না বলে ২টির কথা বেশি বলে কারণ ঐ হাদীসের উপকারিতা বেশি তাই। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

জিজ্ঞাসা (২৭): ***ফরয সিয়াম যদি কারো ভেঙ্গে যায়, তবে তাঁর ব্যাপারে ঐ দিনের জন্য শরীয়তের হুকুম কি? (ক) সারাদিন না খেয়ে থাকা তাঁর জন্য সুন্নত? (খ) কিছুই করতে হবে না, শুধু একটি সিয়াম পরে ক্বাযা করতে হবে? (গ) সারাদিন সিয়াম পালনকারীর মতো কাটিয়ে দেওয়া তাঁর জন্য ওয়াজিব? (ঘ) সিয়াম যেহেতু ভেঙেই গেছে, সুতরাং- কোনো কিছু পানাহার করতে হলে লুকিয়ে করবে?***

মোঃ বেলায়েত হোসেন রবিন
তারাইল, কিশোরগঞ্জ।

জবাব: রমাযানের সওম ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক স্তম্ভ (রুকন)। কোনো মুসলিমের জন্য শরিয়তসম্মত ওজর ছাড়া রমাযানের সওম ত্যাগ করা বৈধ নয়।

আর যে ব্যক্তি শরিয়তসম্মত কোনো ওজরের কারণে যেমন- অসুস্থতা, সফর বা নারীদের ঋতুস্রাব রমাযানের সওম রাখতে পারেনি বা সওম ভেঙেছে, তার ওপর ঐ সিয়ামগুলোর কাযা করা সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা) ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"আর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে, সে অন্য দিনগুলোতে সমপরিমাণ সিয়াম পূরণ করে নেবে।" ***(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৮৫)***

সুতরাং সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না শুধু পরবর্তীতে কাযা আদায় করলেই হবে।

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা ও গাফিলতির কারণে রমাযান মাসের সওম যদিও মাত্র একটি দিনও হয় ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ- শুরু থেকেই সওমের নিয়ত করেনি, অথবা শুরু করার পর শরিয়তসম্মত কোনো ওজর ছাড়াই ভেঙে ফেলেছে, সে অবশ্যই কবিরা (মহাপাপ) গুনাহে লিপ্ত

হয়েছে। তার ওপর মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক তাওবাহ্ করা আবশ্যক।

অধিকাংশ আলেমের মতে, যে দিনগুলো সে সওম রাখেনি সেগুলোর কাযা করাও তার ওপর ওয়াজিব; বরং কিছু আলেম এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনু আবদিল বার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং ধারাবাহিক বর্ণনা হলো, যে ব্যক্তি রমাযানের সওম ফর্য হওয়ার বিশ্বাস রাখার পরও অহংকার ও অবহেলার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সওম রাখেনি, অতঃপর তাওবাহ্ করেছে, তার ওপর ওই সিয়ামগুলোর কাযা করা আবশ্যক।" ***(আল-ইস্তিযকার- ১/৭৭)***

ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "এ বিষয়ে আমরা কোনো মতভেদ জানি না। কারণ সিয়াম তার দায়িত্বে (জিম্মায়) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা আদায় করা ছাড়া সে এ দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না। যেহেতু সে তা আদায় করেনি, তাই দায়িত্ব পূর্বের মতোই বহাল রয়েছে।" ***(আল-মুগনী- ৪/৩৬৫)***

স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি ***(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ১০/১৪৩)***-তে বলা হয়েছে− "যে ব্যক্তি সিয়ামের ফর্য হওয়াকে অস্বীকার করে সিয়াম ত্যাগ করে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। আর যে ব্যক্তি অলসতা ও অবহেলার কারণে সিয়াম ছেড়ে দেয়, সে কাফির নয়; তবে সে অত্যন্ত বড় বিপদের মধ্যে রয়েছে। কারণ সে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ ত্যাগ করেছে, যার ফর্য হওয়ার বিষয়ে মুসলিমদের সর্বসম্মতি রয়েছে। সে শাস্তি ও শাসকের পক্ষ থেকে উপযুক্ত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার উপযুক্ত, যাতে সে এবং অন্যরা বিরত হয়; বরং কিছু আলেম তাকে কাফিরও বলেছেন। তার ওপর আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ্ করা এবং যে সিয়ামগুলো ছেড়ে দিয়েছে সেগুলোর কাযা করা আবশ্যক।"

যদিও কিছু আলেমের মতে কাযা করা লাগবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো শরয়ি ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে সিয়াম বা সালাত ত্যাগ করে, তার জন্য সেগুলোর কাযা নেই; আর তার পক্ষ থেকে তা (পরে আদায় করলেও) সহীহ হবে না।" ***(আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ- ৪৬০)***

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি শুরু থেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে, কোনো শরয়ি ওজর ছাড়া সিয়াম ত্যাগ করে, তাহলে বিশুদ্ধ মত (রাজিহ) অনুযায়ী তার ওপর কাযা আবশ্যক নয়। কারণ, কাযা করে তার কোনো উপকার হবে না; কেননা তা তার কাছ থেকে কবুলই হবে না। এর মূলনীতি হলো− প্রতিটি 'ইবাদতের জন্য শরিয়তে একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। যদি কোনো শরয়ি ওজর ছাড়া সে নির্ধারিত সময়ের পরে তা আদায় করা হয়, তবে তা আদায়কারীর পক্ষ থেকে কবুল করা হয় না।" ***(মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল ইবনু উসাইমীন- ১৯/৮৯)***

জমহুরের মতটাই বেশি নিরাপদ।

তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমাযানের দিনের বেলায় সিয়াম ভঙ্গ করে, তার জন্য ওই দিনের অবশিষ্ট সময় পানাহার ও সিয়ামভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, রমাযান মাসের পবিত্রতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।

জিজ্ঞাসা (২৮): ***রাসূল (ﷺ)-এর সময় কি সাদাক্বাতুল ফিত্র একসাথে জমা করা হতো, না-কি একাকী আদায় করত?***

ওলিউল্লাহ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

জবাব: রাসূল (ﷺ)-এর যুগে সাদাক্বাতুল ফিত্র সাধারণত সংগ্রহ করা হতো। প্রমাণগুলো হলো−

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (ﷺ) يُعْطِيهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا، وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যারা সাদাক্বাতুল ফিত্র সংগ্রহ করতেন তাদের কাছে ঈদের এক বা দুই দিন আগে তা পৌঁছে দিতেন। ***(বুখারী- ১৫১১)***

অনুরূপভাবে আরো পাওয়া যায় বুখারী'র ২৩১১ নং হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলের যুগে ফিতরা একত্রে জমা করা হতো।

তবে ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি দরিদ্রকে দেওয়া বৈধ আবার কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ করে পরে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করাও সুন্নাহসম্মত, যদি তা ঈদের সালাতের আগে হক্বদারদের কাছে পৌঁছে যায়। ***(বুখারী- ১৫০৯)***

জিজ্ঞাসা (২৯): ***আমরা সপরিবারে হজ্জে যাচ্ছি। আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী কি যথেষ্ট হবে? নাকি প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কুরবানী করতে হবে?***

মোঃ মাহফুজ হোসাইন
সরিষাহাটির মোড়, নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

জবাব: যদি কুরবানি উদ্দেশ্য করে থাকেন তাহলে একটাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু হজ্জের হাদী হিসেবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা হাদী লাগবে যদি হজ্জে কিরান বা তামাত্তু করেন। ***(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৯৬)*** তবে উট বা গরুতে শরিকানায় দিতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ।

তعريف الغلاف / প্রচ্ছদ রচনা

পবিত্র মক্কা নগরীর বহুমাত্রিক নাম

মূল: সলাহ আব্দুস সাত্তার মুহাম্মদ
অনুবাদ ও সংযোজন: তানযীল আহমাদ*

ভূমিকা: ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, তাওহীদের আদিভূমি এবং বিশ্ব মুসলিমের হৃদস্পন্দন পবিত্র মক্কা নগরী। এটি কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান নয়; বরং মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন ও বরকতময় জনপদ। আরবি ভাষার সমৃদ্ধি এবং ইসলামের ইতিহাসে মক্কার অনন্য মর্যাদার কারণে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই পবিত্র নগরীকে অসংখ্য নামে ভূষিত করা হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্য ও আরব সংস্কৃতিতে কোনো স্থানের একাধিক নাম থাকা তার মহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। পবিত্র কুরআন, হাদীস, প্রাচীন ইতিহাস এবং ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় মক্কার প্রায় অর্ধশতাধিক নাম পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আমরা মক্কা নগরীর প্রধান প্রধান নাম, উপাধি এবং সেগুলোর নামকরণের পেছনের গভীর অর্থ ও তাৎপর্য উল্লেখ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

মক্কার নামসমূহ ও নামকরণের কারণ

১. মাক্কাহ (مكة): এটি এই নগরীর সর্বাধিক পরিচিত ও মূল নাম। ভাষাবিদদের মতে, এটি تمكك (তামাক্কাকা) শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ মজ্জা টেনে নেওয়া। মক্কা মানুষের হৃদয়কে নিজের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে বলেই এর এমন নাম। কেউ বলেন, এটি মানুষের গুনাহ মোচন (শোষণ) করে নেয়; আবার কারো মতে, এখানে সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে একে মক্কা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ هُوَ الَّذِیۡ کَفَّ اَیۡدِیَهُمۡ عَنۡکُمۡ وَ اَیۡدِیَکُمۡ عَنۡهُمۡ بِبَطۡنِ مَکَّۃَ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ اَظۡفَرَکُمۡ عَلَیۡهِمۡ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرًا﴾

"তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কা ভূমিতে তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য দান করার পর। তোমরা যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।"[১১৩]

২. বাক্কাহ (بكة): পবিত্র কুরআনে এসেছে–

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾

"নিশ্চয়ই মানবজাতির 'ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি নির্মিত হয়েছিল, তা বাক্কায় অবস্থিত।"[১১৪]

অধিকাংশ আলেমের মতে, 'বাক্কাহ' ও 'মাক্কাহ' একই স্থান (কোনো কোনো কবীলা 'মিম' কে পরিবর্তন করে 'বা' উচ্চারণ করেছে)। কেউ বলেন, এটি 'বাক্' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ অত্যাচারীদের ঘাড় ভেঙে দেওয়া। আবার কেউ বলেন, কাবার চারপাশে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় ও সমাগমের কারণে এই নামকরণ হয়েছে।[১১৫]

৩. উম্মুল কুরা (أم القرى): এর অর্থ "জনপদসমূহের জননী" বা সর্বপ্রধান নগরী। পবিত্র কুরআনে মক্কাকে এই নামে ডাকা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾

"আর আমি এভাবেই আরবি কুরআন তোমার প্রতি ওহী করেছি যেন তুমি জনপদসমূহের জননী (মক্কা) এবং এর আশপাশের লোকজনকে সতর্ক করতে পারো।"[১১৬]

পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এবং ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে অন্য সব জনপদের মূল কেন্দ্র বা উৎস হওয়ার কারণে একে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়।[১১৭]

৪ ও ৫. আল-বালাদ (البلد) ও আল-বালদাহ (البلدة): দু'টির অর্থই শহর বা নগরী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই নগরীর শপথ করে বলেছেন,

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ﴾

"আমি শপথ করছি এই নগরীর।"[১১৮]

---

* *সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[১১৩] *সূরা আল-ফাত্হ: ২৪।*
[১১৪] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ৯৬।*
[১১৫] *আল হুজাজ আল মুবাইয়িনাহ ফিত তাফযীল বাইনা মাক্কাহ ওয়াল মাদীনাহ- সুয়ূতি।*
[১১৬] *সূরা আশ্-শূরা-: ৭।*
[১১৭] *তারিখু মাক্কা- আহমাদ সিবাঈ।*
[১১৮] *সূরা আল-বালাদ: ১।*

এখানে 'আল-বালাদ' দ্বারা মক্কাকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে নির্দেশ করা হয়েছে। আবার অন্য আয়াতে এসেছে–

﴿رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ﴾

"এই নগরীর প্রতিপালক।"[১১৯]

৬ ও ৭. আল-আমীন (الأَمِين) **ও আল-মা'মূন** (المأمون)**:** এই নামগুলোর অর্থ নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থান। মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত ও কোনো প্রাণীর ক্ষতি করা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ একে প্রত্যেক ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের জন্য নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আল 'আনকাবূত-এর ৬৭ নং আয়াতে একে "হারামান আমিনা" (নিরাপদ হারাম) বলা হয়েছে।[১২০]

৮, ৯, ও ১০. আল-বাইত (البيت)**, আল-বাইতুল হারাম** (البيت الحرام) **ও আল-বাইতুল আতীক** (البيت العتيق)**:** 'আল-বাইত' বলতে মূলত কাবাকে বোঝায়, যার নামে পুরো মক্কাকেও নির্দেশ করা হয়।[১২১]

যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ বলে এটি 'বাইতুল হারাম'। আর 'আতীক' শব্দের অর্থ প্রাচীন ও স্বাধীন। এটি পৃথিবীর বুকে তাওহীদের সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম কেন্দ্র এবং এটি চিরকাল সব স্বৈরাচারের পরাধীনতা থেকে মুক্ত, তাই এর নাম 'বাইতুল আতীক'।[১২২]

১১. আল-হারাম (الحرم)**:** মক্কার চারপাশের নির্দিষ্ট পবিত্র সীমানা, যেখানে প্রবেশ করতে হলে বিশেষ নিয়ম (এহরাম) পালন করতে হয় এবং যার ভেতরে নির্দিষ্ট কিছু কাজ নিষিদ্ধ।[১২৩]

১২. আল-মাসজিদুল হারাম (المسجد الحرام)**:** কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মহাপবিত্র মসজিদ, যা মুসলিমদের প্রধান কিবলা।

১৩ ও ১৪. আল-বাসসাহ (الباسّة) **ও আল-হাতিমাহ** (الحاطمة)**:** 'বাসসাহ' শব্দের অর্থ যা চূর্ণ করে দেয় এবং 'হাতিমাহ' অর্থ ধ্বংসকারী। এই পবিত্র নগরী তার বুকে আশ্রয় নেওয়া অবাধ্য, নাস্তিক ও সীমালঙ্ঘনকারীদের অহংকার চূর্ণ করে ধ্বংস করে দেয় বলে এর এই নামকরণ।[১২৪]

[১১৯] *সূরা আন্-নামল: ৯১; আল কামুস আল মুহীত- ফিরোযাবাদি।*
[১২০] *তাফসীরে কাশশাফ- যামাখশারি।*
[১২১] *তারিখু মাক্কা- আহমাদ সিবাঈ।*
[১২২] *আল হুজাজ আল মুবাইয়িনাহ- সূয়ুতি।*
[১২৩] *লিসানুল আরব- ইবনুল মানযুর।*
[১২৪] *আল কাশশাফ- যামাখশারী।*

১৫. আর-রা'স (الرأس)**:** মানবদেহে মাথার (রা'স) মর্যাদা যেমন সবার ওপরে, তেমনি পৃথিবীর সব ভূমির মধ্যে মক্কার মর্যাদা সর্বোচ্চ হওয়ায় একে 'আর-রা'স' বলা হয়।[১২৫]

১৬ ও ১৭. উম্মু রাহিম (أم رحم) **ও উম্মু জাহম** (أم زحم)**:** এখানে মানুষের পারস্পরিক দয়া, মমতা ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গভীর হয় বলে এটি 'উম্মু রাহিম' (দয়ার জননী)।[১২৬]

আর মানুষের প্রচণ্ড ভিড় ও কোলাহলের কারণে এটি 'উম্মু জাহম'।[১২৭]

১৮. সালাহ (صلاح)**:** এটি কল্যাণ, আত্মশুদ্ধি, সংশোধন ও সৎকর্মের মূল কেন্দ্র হওয়ার কারণে এই নামে অভিহিত।[১২৮]

১৯. তাইয়্যিবাহ (طيبة)**:** এর অর্থ পবিত্র, সুগন্ধময় ও উত্তম নগরী।[১২৯]

২০, ২১, ও ২২. আল-মুকাদ্দাসাহ, আল-কাদিসাহ ও আল-কাদিস (المقدسة والقادسة والقادس)**:** এই শব্দগুলোর অর্থ পবিত্র, বরকতময় ও সব ধরণের কলুষতা থেকে মুক্ত স্থান।[১৩০]

২৩. আল-মাসাবাহ (المثابة)**:** এমন এক মিলনকেন্দ্র বা আশ্রয়স্থল, যেখানে মানুষ একবার আসার পর বারবার ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

"আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এই গৃহকে (কা'বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল গণ্য করেছিলাম।"[১৩১]

২৪. লাক্কাহ (لقّاح)**:** এর অর্থ স্বাধীন ও অপরাজেয় নগরী। ইতিহাস সাক্ষী, মক্কা কখনো কোনো বিদেশি বিজেতা বা সাম্রাজ্যবাদীদের স্থায়ী পরাধীনতা মেনে নেয়নি।[১৩২]

[১২৫] *লিসানুল আরব- ইবনুল মানযুর।*
[১২৬] *আল কামুস আল মুহীত- ফিরোযাবাদি।*
[১২৭] *তাফসীরে কাশশাফ- যামাখশারি।*
[১২৮] *লিসানুল আরব- ইবনুল মানযুর।*
[১২৯] *আল হুজাজ আল মুবাইয়িনাহ- সূয়ুতি।*
[১৩০] *লিসানুল আরব- ইবনুল মানযুর; আল হুজাজ আল মুবাইয়িনাহ- সূয়ুতি।*
[১৩১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১২৫।*
[১৩২] *তারিখু মাক্কা- আহমাদ সিবাঈ।*

২৫. আর-রিতাজ (الرتاج)**:** বৃহৎ, সুরক্ষিত ও বন্ধ দরজার মতো নিরাপদ দুর্গ অর্থে এই নাম ব্যবহৃত হয়।[১৩৩]

২৬ ও ২৭. আল-আরশ ও আল-আরীশ (العرش والعريش): প্রাচীনকালে মক্কার ঘরবাড়িগুলো ডালপালা ও লাঠি পুঁতে ছায়া তৈরি করে বানানো হতো বলে মক্কাকে এই নামেও ডাকা হতো।[১৩৪]

২৮ ও ২৯. আল-আতাশাহ ও আল-আতাশ (العطشة والعطش): ভৌগোলিকভাবে এটি একদিকে যেমন পানির স্বল্পতা ও শুষ্ক মরুভূমিকে নির্দেশ করে, অন্যদিকে মক্কার প্রতি বিশ্ববাসীর তীব্র ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণাকেও বোঝায়।[১৩৫]

৩০. আন-নাসসাসাহ (النساسة): পানির স্বল্পতা ও শুষ্কতা থেকে উদ্ভূত মক্কার আরেকটি প্রাচীন নাম।[১৩৬]

৩১. মা'আদ (معاد): এর অর্থ চিরন্তন প্রত্যাবর্তনের স্থান। কুরআনে মক্কায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুনরায় ফিরে আসাকে নির্দেশ করতে এই শব্দের ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ إِلٰى مَعَادٍ﴾

"নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ন্যস্ত করেছেন তিনি তোমাকে একটি উত্তম পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেবেন/মক্কায় পৌঁছে দিবেন।"[১৩৭]

৩২. কুথা বা কূসা (كوثى): এটি মূলত প্রাচীন মক্কার একটি নির্দিষ্ট এলাকার (বনি আবদি দারের মহল্লা) নাম, যা পরবর্তীতে পুরো মক্কার প্রাচীন নাম হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়।[১৩৮]

৩৩. আল-বুর্ত (البُرْت): ইয়েমেনি ভাষায় এর অর্থ 'তাবারযাদ' বা উৎকৃষ্ট ও শক্ত দানাদার চিনি। মক্কার প্রাচীন ও মূল্যবান মর্যাদা বোঝাতে এই নাম ব্যবহৃত হতো।[১৩৯]

৩৪. আল-কারইয়াহ (القرية)**:** পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'দুই জনপদ' (মক্কা ও তায়েফ)-এর প্রধান জনপদ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ﴾

"তারা বলে, দু'টি শহরের বড় ব্যক্তিদের কারো ওপর এ কুরআন নাযিল করা হলো না কেন?"[১৪০]

৩৫. তিহামাহ (تهامة): মক্কা ও তার আশপাশের বিস্তৃত উপকূলীয় পাহাড়ি অঞ্চলকে তিহামাহ বলা হয়। এই অঞ্চলের প্রধান শহর হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অনেক সময় 'তিহামী'ও বলা হতো।[১৪১]

৩৬. মাকোরাবা (مكوربا/Macoraba): প্রাচীন সাবায়ী, বাবিলীয় এবং গ্রিক-রোমান সূত্রে মক্কার এই ঐতিহাসিক নামটি পাওয়া যায়। বিখ্যাত ভূগোলবিদ টলেমি মক্কাকে এই নামেই উল্লেখ করেছিলেন, যার অর্থ 'পবিত্র স্থান' বা 'হারাম'।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর, ইতিহাস ও প্রাচীন আরব্য সাহিত্যে মক্কার আরো কিছু নাম পাওয়া যায়, যেমন- বাররাহ (উত্তম), ফারান (হিজাজের পাহাড়ি অঞ্চলের প্রাচীন নাম) ইত্যাদি।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, মক্কা নগরীর এই নামের প্রাচুর্য কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য নয়; বরং এটি এই শহরের ঐতিহাসিক গভীরতা, ভৌগোলিক গুরুত্ব এবং অতুলনীয় আধ্যাত্মিক মর্যাদার জীবন্ত দলিল। 'মক্কা' যেমন মানুষের হৃদয়কে চুম্বকের মতো টানে, 'উম্মুল কুরা' হিসেবে এটি তেমনি বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। আবার 'আল-আমীন' বা 'কাদিস' হিসেবে এটি মানুষের আত্মিক শান্তি ও পবিত্রতার পরম ঠিকানা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত– গ্রিক ইতিহাসবিদের 'মাকোরাবা' থেকে কুরআনের 'বালাদিল আমীন'– প্রতিটি নামই মক্কার এক একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে উন্মোচন করে। পৃথিবীর বুকে এই একটি শহরই, যার নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে ভক্তি, প্রেম ও মিলনের আকুলতা জেগে ওঠে।

[১৩৩] *ই'লামুস সাজিদ বি আহমাকিল মাসাজিদ- যারকাশি।*
[১৩৪] *আল কামুস আল মুহীত- ফিরোযাবাদি।*
[১৩৫] *আল হুজাজ আল মুবাইয়িনাহ- সূয়ুতি।*
[১৩৬] *তাফসীরে কাশশাফ- যামাখশারি।*
[১৩৭] *সূরা আল-ক্বাসাস: ৮৫।*
[১৩৮] *আল আসমা আল মুবহামা ফিল আনবা আল মুহকামা- খতীব বাগদাদী।*
[১৩৯] *লিসানুল আরব- ইবনুল মানযুর।*
[১৪০] *সূরা আয্-যুখরুফ: ৩১।*
[১৪১] *তারিখু আবিল ফিদা।*

ঈদে মীলাদুন্নাবী: শা'রঈ বিশ্লেষন

[প্রথম পাতা]

ঈদে মীলাদুন্নাবী: শারঈ বিশ্লেষণ

ইবাদত নয় অথচ ইবাদতের মতো করে বা তার থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়ে গভীর আবেগ-ভালবাসা, ভাব-গাম্ভীর্য ও আড়ম্বরপূর্ণ করে উদযাপন করা হয় ঈদে মীলাদুন্নাবী। রাসূল (সা) এর জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে উদযাপিত এ উৎসবটি ইসলামের স্বর্ণ যুগে কি উদযাপিত হয়েছে? যুগে যুগে দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, নির্ভরযোগ্য ও প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম এ উৎসব পালনের বিষয়ে কি বলেছেন আসুন আমরা তা জানার চেষ্টা করি।

ঈদে মীলাদুন্নাবী কী?

ঈদে মীলাদুন্নাবী তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাক্য। ঈদ মানে আনন্দ, মীলাদ অর্থ জন্মস্থান বা জন্মদিন আর নবী অর্থ বার্তাবাহক। হিজরী ক্যালেন্ডারের তৃতীয় মাস। রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে নবী মুহাম্মদ (সা) এর জন্মদিন উপলক্ষে উদযাপিত তথাকথিত উৎসবটিই ঈদে মীলাদুন্নাবী নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও 'মাওলীদ' এবং 'মীলাদ' নামেও প্রচলিত।

ঈদে মীলাদুন্নাবীর ইতিহাস

সকল আলেম ও গবেষক এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে) ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন করার কোনো প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী লিখেছেন, ইসলামের মুবারক প্রথম তিন শতাব্দীর সালাফে সালেহীনদের মধ্যে কোনো একজনও এই কাজ করেননি।"

দুই ঈদের বাইরে তৃতীয় কোনো দিবসে প্রথমবারের মতো ধর্মীয় উৎসব উদযাপন শুরু হয় চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝিতে শিয়াদের উদ্যোগে। এসব উৎসবের বেশিরভাগই ছিল জন্মদিন ও মৃত্যুদিন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মিসর, সিরিয়া এবং ইরাকের কিছু কিছু মানুষ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ কিংবা ১২ তারিখে আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু শিয়ারা এই দিবস পালন করলেও ধীরে ধীরে তা সামাজিক রূপ লাভ করে। তবে, ঈদে মীলাদুন্নাবীর প্রবর্তক হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হলেন ইরাক অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের শাসক আবু সাঈদ কাওকাবুরি। তিনিই প্রথম সুন্নিসহ বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈদে মীলাদুন্নাবীর প্রবর্তন করেন। ঈদে মীলাদুন্নাবীর ওপর সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করে ঈদে মীলাদুন্নাবী প্রচলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে হাসান ইবনে দেহিয়া আল কালবি। এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করার জন্য কাওকাবুরি তাকে ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেছিলেন। ৯০ বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং ঈদে মীলাদুন্নাবী নিয়ে মানুষের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেন।

ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের বিধান

রাসূল (সা) এর জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে ঈদে মীলাদুন্নাবীসহ যেসকল আচার-অনুষ্ঠান ও রসম-রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত রয়েছে তা ইসলামী শরীয়াতে অবৈধ ও অননুমোদিত বরং অধিকাংশই বিদ'আত ও নিষিদ্ধ কর্ম। ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ দলীলসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন করা দ্বীনের মধ্যে এমন বিদ'আত যার পক্ষে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোন দলীল নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর, আয়াত: ৭) আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মাঝে এমন নতুন কিছু প্রচলন করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৪২)।

দ্বিতীয়ত: রাসূল (সা) এর পরে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিবর্গ খোলাফায়ে রাশেদীন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম কখনো ঈদে মীলাদুন্নাবীর অনুষ্ঠান করেননি এবং এ পথে মানুষকে আহ্বানও করেননি। অথচ রাসূল (সা) খোলাফায়ে রাশিদীন সম্পর্কে বলেন: "তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় সংযোজন থেকে বিরত থাকবে। কারণ দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন বিষয় বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হল ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।" (সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং ৩৯৯১)।

তৃতীয়ত: ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা বিপথগামী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নীতি। কারণ হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে শিয়া বংশোদ্ভূত উবায়দীরা এ মীলাদ চালু করে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা নিজেদেরকে ফাতেমা (রা) এর প্রতি সম্পৃক্ত করে। বাস্তবে তারা অগ্নিপূজক ও ইয়াহুদীদের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে তাদেরকে নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। (লিসানুল আরব লি-ইবনে মনযুর ১৩/২২৫)

চতুর্থত: এ ধরনের বিদ'আতী জন্মোৎসব পালন দ্বারা মনে হয় আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য পরিপূর্ণ করেননি। তাই এমন কিছু শারঈ বিষয় নতুন করে প্রবর্তন করা জরুরী যা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা দিবে। আর রাসূল (সা) যথাযথভাবে উম্মাতের নিকট দ্বীন পৌঁছাননি- নাউযুবিল্লাহ। অথচ মহান আল্লাহ্ দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে ঘোষণা করেছেন: "আজ আমি তোমাদের জন্য...

তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিয়ে ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।" (সূরা মায়িদাহ্, আয়াত নং- ৩) আর নবী (সা) দ্বীন ইসলামকে মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন। জান্নাতে যাওয়ার ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার সকল পথ ও উপায় তিনি উম্মাতকে বলে গেছেন। অতএব, ঈদে মীলাদুন্নাবী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মত দ্বীনের কোনো অংশ হলে রাসূল (সা) উম্মাতের উদ্দেশ্যে তা অবশ্যই বর্ণনা করতেন অথবা নিজের জীবদ্দশাতেই তিনি তা পালন করতেন।

পঞ্চমত: রাসূল (সা) এর প্রতি অলীক ভালবাসার দাবীদাররা ঈদে মীলাদুন্নাবী পালনের মাধ্যমে রাসূল (সা) এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে চায়। অথচ রাসূলের (সা) আনুগত্য, অনুসরণ ও সুন্নাতের উপর আমল করার দ্বারাই তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্ বলেন: "আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার আনুগত্য করো। তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মোচন করে দিবেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৩১)

ষষ্ঠত: নবী (সা) এর জন্মবার্ষিকী পালন করার দ্বারা উৎসবের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখা হয়। অথচ তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখা ও অন্ধ অনুকরণ করা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (ইক্তিযাউস্ সিরাতুল মুস্তাক্বীম লি-মুখালিফাতি আস্হাবিল জাহীম ২/৬১৪, যাদুল মা'আদ ১/৫৯)

সপ্তমত: বিবাদপূর্ণ যেকোনো বিষয়ে শারঈ নীতি হলো বিবাদমান বিষয়টিকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সমাধান করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও তবে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটা তোমাদের জন্য ঝগড়া করা থেকে ভাল এবং উত্তম ব্যবস্থাপনা। (সূরা আন নিসা, আয়াত নং-৫৯) আর নিঃসন্দেহে, ঈদে মীলাদুন্নাবীর বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে যাচাই করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের নির্দেশ দেননি, তেমনি রাসূল (সা) ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করতে আদেশ করেননি এবং তিনি নিজে বা তাঁর কোনো সাহাবী ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করেননি। তাই আবশ্যকভাবে জানা গেল যে, ঈদে মীলাদুন্নাবীসহ যেকোনো মীলাদ মাহফিল দ্বীনের অংশ নয়; বরং তা স্পষ্ট বিদ'আত।

অষ্টমত: একদিকে রাসূল (সা) এর জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আওয়াল নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। সিরাত বিষয়ে জনপ্রিয় কিতাব আররাহীকুল মাখতুমের লেখক শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সঠিক কথা হলো রাসূল (সা) ৯ই রবিউল আওয়াল জন্ম গ্রহণ করেন। অপরদিকে এটা নিশ্চিত যে, তিনি ১২ই রবিউল আওয়ালে মৃত্যু বরণ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো বিদ'আতীরা তাঁর মৃত্যুর দিবসটিকেই জন্মদিন হিসেবে পালন করে সে দিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে (!) অথচ মূর্খদের এ জ্ঞানটুকু নেই যে, তারা প্রিয় নবীর মৃত্যুদিবসে আনন্দ প্রকাশ করে কাফেরদেরকেই খুশী করছে।

এক নজরে ঈদে মীলাদুন্নাবীতে সংঘটিত শরীয়ত বিরোধী কার্যাদি

এসকল অনুষ্ঠানের অধিকাংশেই যেসকল কাসীদাহ্ গাওয়া হয় তা শিরক ও বিদ'আতে পরিপূর্ণ। অনেক স্থানে তো মীলাদের নামে গান-বাজনা এবং ঢোল-তবলাও বাজানো হয়।

..নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

..রাসূল (সা) কে নিয়ে অতিরঞ্জন করা। অথচ রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা আমাকে নিয়ে এমন অতিরঞ্জন করো না যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ) কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন বান্দা। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলেই সম্বোধন করবে। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫)

..ঈদে মীলাদুন্নাবীর র‍্যালি, মিছিল ও শোভাযাত্রা প্রদর্শনী– যা শরীয়াহ পরিপন্থী।

..মীলাদ পালনকারী অনেকে আবার এও বিশ্বাসও করে যে, নবী (সা) তাদের মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। এ জন্য মীলাদ মাহফিলে একটি চেয়ার খালি রেখে ঐ সময় কিয়াম করা হয়। যা স্পষ্ট শিরকী আক্বীদাহ্।

..এছাড়াও শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ড পালন করা হয়। যা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার স্পষ্ট লঙ্ঘন।

হে মুসলিম! দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু আবিষ্কার করাই বিদ'আত- যা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) হারাম করেছেন। এ সকল বিদ'আতের অন্যতম হলো ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন। অতএব সর্বোচ্চ সতর্ক হয়ে আপনাকে বিশুদ্ধ দ্বীন গ্রহণ করতে হবে। ঈদে মীলাদুন্নাবীর মতো শরীয়াহ বহির্ভূত পন্থায় কোনো ইবাদত করলে তার সওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা উল্টো পাপের বোঝা বহন করতে হবে।

তাই, আজই তা পরিহার করে সুন্নাতে রাসূলকে আঁকড়ে ধরুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সুন্নাতে রাসূল আঁকড়ে ধরে শিরক ও বিদ'আত পরিহার করার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪, info.shubbanbd@gmail.com, www.shubbanbd.org, Facebook: /shubbanbd

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত